রৌদ্রঝলক

রৌদ্রবালক

প্রফুল্ল রায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩,

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
আগস্ট—১৯৬১

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্রীময়ূখ বসু
কল্যাণীয়েষু

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

পূর্বপার্বতী
আমাকে দেখুন ১/২/৩
নিজের সঙ্গে দেখা
আমার নাম বকুল
শঙ্খিনী
রৌদ্রঝলক
সুখের পাখি অনেক দূরে
শীর্ষবিন্দু
একাকী অরণ্যে
নয়না
আলোয় ফেরা
মহাযুদ্ধের ঘোড়া ১/২
আকাশের নীচে মানুষ
স্বর্গের ছবি
সিন্ধুপারের পাখি
নোনা জল মিঠে মাটি
ধর্মান্তর
তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ

রৌদ্রঝলক

ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের আঠারোতলা অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটার নাম 'ওসেন বার্ড'। তার যে কোন ফ্ল্যাট থেকে যতদূর চোখ যায় শুধু আরব সাগর।

ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের এই দিকটায় ব্যাক বে। বম্বে শহরের এটা পশ্চিম প্রান্ত।

'ওসেন বার্ডে'র ঠিক তলাতেই সী সাইড রোড। কালো ফিতের মতো রাস্তাটা ঘোড়ার খুরের আকারে বাঁ দিকে বেঁকে মাহিম ক্রীকে চলে গেছে; ডাইনে গেছে পালি হিল আর ডাণ্ডা পেরিয়ে জুহুর দিকে। 'ওসেন বার্ডে'র উল্টোদিকে সী সাইড রোডের ঠিক ওপারেই একটা ফ্যাশনেবল রেস্তোরাঁ। তারপর থেকে সমুদ্র শুরু।

'ওসেন বার্ডে'র বারোতলার ফ্ল্যাটে জানালার ধার ঘেঁষে একটা ডিভানের ওপর শুয়ে ছিল পাবু। বান্দ্রার মিশনারি স্কুল আর চৌপাটি ড্রাইভের উইলসন কলেজে তার একটা পোশাকী নামও ছিল—রাজীব।

পাবুর বয়েস কুড়ি-বাইশের মত, পাতলা ধারালো চেহারা, শরীরে এক গ্রাম বাজে চর্বি নেই। গায়ের চামড়া টান-টান, মসৃণ। রঙ পাকা গমের মতো। বড় বড় চোখ, নাক-মুখ লম্বা ছাঁদের এবং কাটা কাটা। আজকালকার 'মড' ছেলেদের যেমন হয়, পাবুর কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ঘন চুল, গালের মাঝামাঝি চওড়া জুলপি, পরনে বেল-বটস্। এক কথায় সে খুবই আকর্ষণীয়। তবে তার বয়সী ছেলেদের যতটা তাজা এবং টগবগে হওয়া উচিত পাবু কিন্তু তেমন নয়, তাকে ঘিরে অদ্ভুত ক্লান্তি আর বিষাদ জড়ানো।

এখন ঠিক বিকেলও নয়, আবার সন্ধ্যেও হয় নি। অনেক—অনেক দূরে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে সমুদ্রে নেমেছে, সূর্যটা অদৃশ্য সুতোয় যেন সেখানে ঝুলছে। একটু পরেই সুতোটা ছিঁড়ে যাবে আর সূর্য আরব সাগরের অগাধ জলে তলিয়ে যাবে।

নভেম্বরের মাঝামাঝি এই সময়টায় কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই, আকাশ পালিশ-করা আয়নার মতো ঝকঝকে। শেষ বেলার লালচে আভা গায়ে মেখে ঝাঁক ঝাঁক সাগরপাখি উড়ছিল। সমুদ্রে ঢাউস ঢাউস পাল-লাগানো জেলে নৌকোগুলো মাহিম ক্রীক আর ডাণ্ডা কোস্টের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। দক্ষিণে ওর্লি সী ফেসের কাছে উঁচু টেলিভিসন টাওয়ারটা এখন আর দেখা যাচ্ছে না; ওদিকটা দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যেই উল্টোদিকের রেস্তোরাঁটায় ভিড় জমে গেছে; সমুদ্রের পারে একেবারে জলের ধার ঘেঁষেও অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। ওদের বেশির ভাগই বেল-বট্‌স্ আর প্যারালাল পরা অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে। ওরা এসেছে জোড়ায় জোড়ায়। চৌপাটি, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া আর জুহু বীচের পর এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডও একটা 'লাভার্স ডেন' হয়ে উঠেছে।

হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে তাকিয়েই আছে পাবু, তাকিয়েই আছে। এক সময় সূর্য ডুবে গেল। আকাশ সমুদ্র রাস্তা, সব আবছা হয়ে হয়ে ঝপ করে সন্ধ্যে নেমে গেল। পাবু কিন্তু উঠল না, যেমন ছিল তেমনি শুয়ে থাকল। সেই দুপুর থেকে এই ভাবেই শুয়ে আছে সে।

সন্ধ্যে হতে না হতেই চারধারের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস, সী সাইড রোড, ওধারের রেস্তোরাঁয় আলো জ্বলে উঠেছে। সারাদিন আজ তেমন হাওয়া ছিল না; অন্ধকার নামবার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিক থেকে উল্টোপাল্টা ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে ছুটে আসছে।

পাবুদের এই বিশাল আঠারোতলা বাড়ির একশো আটটা ফ্ল্যাটের প্রায় সবগুলোতেই আলো জ্বলে উঠেছে; শুধু দুটো বাদ। একটা তাদের, অন্যটা তাদের পাশের ফ্ল্যাট। পাশের ফ্ল্যাটটা পাঁচ-ছ মাস ধরে বন্ধ। পাবু শুনেছিল, কে এক সিন্ধী বিজনেসম্যান ওই ফ্ল্যাটটা কিনেছে। কিনে ফেলেই রেখেছে; একদিনও এসে থাকে নি। চারধারে আলোর ফোয়ারার মাঝখানে এই ফ্ল্যাটদুটো কেমন যেন ভুতুড়ে মনে হয়।

সন্ধ্যের কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, আচমকা ঠিক পাশের ফ্ল্যাটটায় আলো জ্বলে উঠল।

পাবুদের এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটা ইংরেজী 'এল' অক্ষরের মত খাঁজকাটা। খাঁজের এধারে তাদের ফ্ল্যাটটা থেকে ওপাশের ফ্ল্যাটের অনেকটাই দেখা যায়; অবশ্য দরজা জানলা খোলা থাকলে। দরজা-টরজা এখন বন্ধ, তবু জানলাগুলোর ঝাপসা রঙের কাচে আলোর প্রতিফলন দেখে বোঝা যাচ্ছে, কেউ এসেছে।

ভতর থেকে টুকরো টুকরো অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসেও আসছে।

প্রথমটা অবাক হয়ে গেল পাবু। কে এল ওই ফ্ল্যাটটায়? পরক্ষণেই মনে পড়ল, সেই সিন্ধী বিজনেসম্যানটাই হয়তো এসেছে। সারাদিনে না এসে রাত করে আসার মানে কি? ভাবতে গিয়ে পাবু নিজের ওপরেই বিরক্ত হল। নিজের াটে কেউ যদি মাঝ রাত্তিরেও আসে, তাতে তার কী? নিজের অজান্তেই আস্তে আস্তে ডিভানে উঠে বসল পাবু।

এর মধ্যে ওধারের ফ্ল্যাটটার দরজা জানলা খুলে গিয়েছিল। অন্ধকার ঘরে সে পাবু একটি মধ্যবয়সী লোক আর কম বয়েসের একটি মেয়েকে দেখতে পেল ব থেকে তাদের চোখমুখ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না।

মেয়েটা যেন হাওয়ায় উড়ছিল। ছুটে ছুটে এঘর ওঘর করছিল সে, আর প্রচুর হাসছিল, মধ্যবয়সী লোকটা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিল ঠিকই তবে ছোটাছুটি করতে পারছিল না। তবে সেও হাসছিল।

হাসতে হাসতে আর ছুটতে ছুটতে ওরা এক সময় বাইরের ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। এবার ওদের স্পষ্ট দেখতে পেল পাবু।

যা আন্দাজ করেছিল, লোকটার বয়েস পঞ্চাশের মতো, দু'এক বছর হয়তো বেশিই হবে। ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা, চ্যাটালো বুক, চওড়া কাঁধ, গোল মতো মুখ। লোকটা বেশ লম্বা, মোটা মোটা হাড়ের ফ্রেমে তার স্বাস্থ্য দেখবার মতো। মড'দের মত তার ঘাড় পর্যন্ত চুল, গালের মাঝামাঝি জুলপি। একটা চুলও সাদা নয়, খুব সম্ভব হেয়ার ডাই ব্যবহার করে।

মেয়েটা আঠারো-উনিশের বেশি হবে না। পরনে বেল-বট্‌স্। হেয়ার টনিক লাগানো চুল সিল্কের মতো নরম, ডিমের মতো লম্বাটে মুখ, চিবুকে চমৎকার খাঁজ। গলাটা যেন সোনার ফ্লাওয়ার ভাস। নিভাঁজ মসৃণ ত্বকে আলো ঠিকরে যাচ্ছিল। সরু কোমরে স্প্যানিস ক্রুদের মতো চওড়া বেল্ট। চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো গোল বুক, কোমরের তলার দিকটা ভারী এবং বিশাল। সেক্স অ্যাপীল তার ম্যানিকিওর করা পায়ের নখ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত সব জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

মাঝবয়সী লোকটা বলল, 'ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের এই ফ্ল্যাটটা কেমন লাগছে জুলি?'

মেয়েটা টগবগ করে ফুটছিলই। উচ্ছ্বাসের গলায় বলল, 'ফাইন।'

'এরকম ফ্ল্যাট সারা বোম্বাইতে তুমি খুব বেশি পাবে না।'

'রিয়ালি। আমার কি ভাল যে লাগছে। যে ঘরেই যাচ্ছি সেখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি। চার্মিং।'

'যাক, ফ্ল্যাটটা তাহলে পছন্দ করলে?'

'প্যাসনেটলি আদভানি সাহেব, প্যাসনেটলি।'

জুলির সঙ্গীর নামটাও জেনে ফেলল পাবু—আদভানি। আদভানি নাম নয়, পদবী। যাক, ওতেই চলবে।

আদভানি বলল, 'তুমি লাইক করেছ, ফ্ল্যাটটা কেনা আমার সার্থক।'

'বলছেন!' জুলি জোরে হেসে উঠল। মেয়েটার হাসির শব্দ ভারি সুন্দর, দ্রুত তালে অর্কেস্ট্রা বেজে যাবার মতো।

আদভানি আবার বলল, 'নিশ্চয়ই বলছি। জানো জুলি, ফ্ল্যাটটার একটা মজা আছে। ও ধারের ঘর থেকে সমুদ্রে সানরাইজ দেখতে পাবে, আর এধারের ঘর থেকে সানসেট।'

'রাত্তিরে তাহলে ওধারের ঘরে শোব, কাল সানরাইজ দেখতে হবে।

'অ্যাজ ইউ লাইক। চল, ভেতরে যাই।'

ওরা ব্যালকনি থেকে ঘরের মধ্যে চলে গেল। যাবার সময় বাইরের দিকের দরজাটা টেনে দিল।

তারপরও অনেকক্ষণ ডিভানের ওপর বসে থাকল পাবু।

মধ্যবয়সী আদভানি আর আঠারো-উনিশ বছরের জুলি, মাত্র এই দুজনকেই দেখা গেল। ওরা ছাড়া ওই ফ্ল্যাটে আর কেউ আসে নি হয়তো। অসমবয়সী একটি পুরুষ এবং একটি মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক কী? কোনরকম আত্মীয়তা? ওদের কথাবার্তা থেকে কিছুই বোঝা যায় নি।

জুলিদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজের ওপর ভীষণ রেগে গেল পাবু। আশ্চর্য উদাসীন এই বম্বে শহরে কেউ কারো সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না। পাশাপাশি ফ্ল্যাটে বছরের পর বছর বাস করবার পরও দেখা গেছে কেউ কারো নাম জানে না। এইরকম এক শহরের সবটুকু উদাসীনতা যেন পাবুর ওপর ভর করে আছে, কারো সম্বন্ধে তার তেমন কৌতূহল নেই। তবু কেন যে পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের নিয়ে সে ভাবতে বসল পাবু জানে না।

টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়বার মতো করে জুলিদের ভাবনাটাকে উড়িয়ে দিল পাবু। তারপর ডিভান থেকে নেমে সুইচ টিপে আলো জ্বালল

শুধু এই ঘরটারই না, তাদের ফ্ল্যাটের চারখানা ঘর, করিডর, সব জায়গায় আলো জ্বেলে দিল।

এখন সে ছাড়া ফ্ল্যাটে আর কেউ নেই। গাড়োয়ালী কুক রবিশটা নিচে গিয়ে অন্য ফ্ল্যাটের বয় বা কুকদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। দিক গে। পাবু

করিডরে বেসিনের ওপরকার আয়নার সামনে গিয়ে হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিল। তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সারা দিন ডিভানের ওপর শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিয়েছে, এখন আর ভাল লাগছে না। মাথাটা ধরেছে, অদ্ভুত এক আলস্য জ্বরের মত গায়ে ছড়িয়ে আছে।

ফ্ল্যাটের বাইরের দিককার দরজা খোলাই পড়ে রইল পাবু যখন বেরোয়, দরজাটা কখনও বন্ধ করে না। চোরেরা যদি ঢুকে পড়ে, ঢুকুক। সর্বস্ব তুলে নিয়ে গেলেও তার মনে বিন্দুমাত্র দাগ পড়বে না। কোন ব্যাপারেই পাবুর মায়া মমতা আকর্ষণ, কিচ্ছু নেই।

বাইরে এসে সোজা লিফ্‌টের কাছে চলে গেল পাবু, সুইচও টিপল। কিন্তু লিফ্‌ট আসার নাম নেই। হঠাৎ তার মনে পড়ল, এ বছর মহারাষ্ট্রে দারুণ 'ড্রট' গেছে; ফলে দিনের কয়েক ঘণ্টা ইলেকট্রিসিটি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তার মানে লিফ্‌ট এখন আসবে না, পায়ের কলকব্জা নড়িয়ে দেড় শো সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে হবে।

তাদের অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটা ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মাথায়। সেখান থেকে ঢালু রাস্তা নিচে নেমে সী সাইড রোডে মিশেছে।

পাবু সমুদ্রের পারের রাস্তায় চলে এল। ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে এখন প্রচুর ভিড়, রেস্তোরাঁটা জমজমাট। অন্যমনস্কের মতো এক পলক রেস্তোরাঁটার দিকে তাকাল পাবু; তারপর যখন ডানদিকে ঘুরতে যাবে সেই সময় হুল্লোড় বাধিয়ে কারা যেন ডেকে উঠল, 'পাবু—হ্যাল্লো পাবু—'

পাবু থমকে দাঁড়িয়ে গেল; এধার ওধার তাকাতে লাগল।

যারা ডাকাডাকি করছিল তারা আরো গলা চড়াল, 'দিস সাইড ম্যান—'

এবার ওদের দেখা গেল। রেস্তোরাঁর সামনের দিকে পাবুরই বয়সী ক'টা 'মড' ছেলেমেয়ে বসে আছে। তাদের নামও জানা—আলবার্ট, লিসি, যোগিতা, জগজিৎ, সোনি, নরসি। ওদের কেউ সিন্ধি, কেউ পার্শী, কেউবা গোয়ানিজ পিক্র। এক সময় ওদের সঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়েছে পাবু। ওরা এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে থাকে না; তবে কাছাকাছি খার, পালি হিল, বান্দ্রার দিকে থাকে। বিকেল হলে ওরা রোজই এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে হুল্লোড় করতে আসে। চোখাচোখি

হতেই নরসিরা জোরে জোরে হাত নাড়তে লাগল, 'কাম হীয়ার ম্যান, কাম হীয়ার—'

ওদের খুব একটা পছন্দ করে না পাবু। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে গেল। তবে রেস্তোর াঁয় ঢুকল না, রাস্তায় দাঁড়িয়েই বলল, 'কী বলছ?'

জগজিৎ হাতের ইশারায় জানাল তাদেব সঙ্গে দুটো ফেনীর (এক ধরনের দিশী মদ) বোতল আছে।

মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে বসে পাবু দেশী খায়। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছিল না। সে বলল, 'তোমরা খাও—'

'তুমি খাবে না?'

'না, ভাল লাগছে না।'

'ফেনী খেতে ভাল লাগছে না! ব্লাড্ডি গো ট্ হেল—

পাবু আর দাঁড়াল না, সমুদ্রের ধাব দিয়ে হাঁটতে লাগল। সী সাইড রোডের পর এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জায়গা তাবপর সমুদ্র। জোয়াবের সময় পাথুরে জায়গাটা জলে ডুবে যায়, ভাটায় ভেসে ওঠে।

এখন সমুদ্রে ভাটার টান চলছে। ওপাশেব বড় বড় অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসগুলো থেকে যে আলো এসে পড়েছে তাতে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে জলেব ধারের পাথুরে ডাঙায় জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে বসে আছে। তাদের বেশির ভাগেরই পাশে ফেনীর বোতল। মহারাষ্ট্র সবকাব প্রহিবিসান তুলে দেবার পর বম্বেতে এখন মদের ফোয়ারা ছুটেছে। ছোকরা ছুকরিদেব দেখতে দেখতে দাঁতে দাঁত চেপে পাবু উচ্চারণ করল, 'বাস্টার্ড্স—'

পাবু সী সাইড রোড ধরে হেঁটেই চলেছে। পাশ দিয়ে হুস হুস করে প্রাইভেট কার এবং ট্যাক্সি বেরিয়ে যাচ্ছিল সমুদ্র থেকে ঝোড়ো বাতাস পারেব নারকেল গাছগুলোতে ভেঙে পড়ছে, আওয়াজ উঠছে সাঁই সাঁই

মিনিট দশ পনের হাঁটবার পর ডাইনে হিল রোড পাওয়া গেল। পাবু সেদিকে গেল না। সমুদ্রের পাড় ধরে সে হাঁটতে লাগল ডাণ্ডাব দিকে। ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড থেকে যত উত্তরে সে যাচ্ছে ততই নির্জনতা বাড়ছে। এদিকটা অতটা জমজমাট নয়। লোকজন বাড়িঘরও কম।

কখন যেন সমুদ্রের তলা থেকে হলুদ রঙের চাঁদ উঠে এসেছে চারদিকের নির্জনতা, উল্টোপাল্টা হু-হু বাতাস, চাঁদ কিংবা আবহ সাগরের ব্যাক বে— কিছুই লক্ষ্য করছিল না পাবু। অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ সুরটা কানে এল, উল্টো দিক থেকে সেটা এগিয়ে আসছে।

সুরটা খুবই চেনা, নিশ্চয়ই জেকব ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে। পাবু জানে সন্ধ্যের পর ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের রাস্তায় বুড়ো জেকব আপন মনে ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে বেড়ায়।

সী সাইড রোডটা এদিকে ঠিক সরলরেখার মতো নয়, খাঁজ কাটা কোস্টের পাশ দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে। একটা বাঁকের মুখে আসতেই জেকবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ম্যাণ্ডোলিনের তারে ঝড়ের বেগে ঝঙ্কার তুলে সে এগিয়ে আসছিল।

অনেক দিন থেকেই পাবু জেকবকে চেনে। আট দশ বছর, কি তারও বেশি হবে, পাবুরা তখনও ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের 'ওসেন বার্ডে' আসে নি, থাকত থারের কাছে আম্বেদকর রোডে—সেই সময় থেকে জেকবের সঙ্গে তার জানা শোনা। থারে থাকতেও মাঝে মাঝে সন্ধ্যের দিকে মা-র সঙ্গে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বেড়াতে আসত। যেদিনই আসত, দেখত, আপন মনে ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে হেঁটে যাচ্ছে জেকব। ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে আসার পর তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে পাবুর, এক ধরনের বন্ধুত্বও। লোকটাকে তার ভাল লাগে।

জেকব কাছে এসে গিয়েছিল। বেশ বয়েস হয়েছে, প্রায় চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি। দশ বারো বছর আগে প্রথম যখন জেকবকে দেখেছিল পাবু, তখন সে বেশ সুপুরুষ. টান টান চেহারা, মাথা ভর্তি লালচে ধরনের চুল।

বয়সের ভারে এখন সামনের দিকে একটু ঝুঁকে ঝুঁকে হাটে জেকব, চুল অনেক পাতলা হয়ে গেছে। শরীর ভেঙেচুরে হাড়ের ফ্রেম বেরিয়ে পড়েছে। দৃষ্টি ঘোলাটে। আরব সাগরের নোনা হাওয়ায় চামড়া সজীবতা হারিয়ে রুক্ষ কর্কশ আর তামাটে হয়ে গেছে। মুখময় ছুরির আঁচড়ের মতো বয়েসের অগুনতি রেখা।

অনেক কালের পুরনো তালিমারা ঢলঢলে একটা ট্রাউজার আর ধুসো কোট জেকবের পরনে। পায়ে ছেঁড়াখোঁড়া মোজা এবং কেড্‌স।

লোকটা গোয়ার রোমান ক্যাথলিক কৃশ্চান, গলায় কালো কারে স্টীলের একটা ক্রশ ঝুলছে।

পাবু ডাকল, 'আঙ্কল—' এই নামেই জেকবকে ডাকে সে।

জেকব দাঁড়িয়ে পড়ল। অনেকটা ঝুঁকে পাবুকে ভাল করে লক্ষ্য করল। তারপর চিনতে পেরে একমুখ হেসে বলল, 'ও পাবু? মাই ডিয়ার সন—'

আজকাল ভাল দেখতে পায় না জেকব। পাবু জানে তার চোখে ছানি পড়ছে। সে বলল, 'ইয়েস আঙ্কল—'

কথা বলতে বলতে ম্যাণ্ডোলিনের তারে আলতো করে আঙুল বুলিয়ে যাচ্ছিল জেকব, টুং টাং শব্দ উঠছিল।

জেকব বলল, 'তোমার মা মহাবলেশ্বর থেকে ফিরেছে?'

পাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, 'না।'

পাবুর জীবনের মোটামুটি সব কথাই জানে জেকব, তাব কথাও কিছু শুনেছে পাবু। একটা জায়গায় দুজনের আশ্চর্য মিল। সে কথা পরে। জেকব জিজ্ঞেস করল, 'এক উইক আগে তোমার মা মহাবলেশ্বর গেছে না?'

পাবু অস্পষ্ট গলায় বলল, 'হুঁ'।

'সঙ্গে সেই লোকটাও তো গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'সে ফিরেছে?'

'জানি না। ডোণ্ট আস্ক এনিথিং অ্যাবাউট দেম। আই অ্যাম টায়ার্ড আঙ্কল—'

'যাক গে, যাক গে।' জেকব বলতে লাগল, 'এখন কোথায় চললে?'

পাবু বলল, 'কোথায় আর যাব, ঘুরছি।'

'মাউণ্ট মেরি চার্চে যাবে নাকি?'

'না। আজ থাক।'

'আচ্ছা, তাহলে তুমি বেড়াও। আমি চলি।' ম্যাণ্ডোলিনে দ্রুত আঙুল চালাতে চালাতে সামনেব দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে জেকব চলে গেল।

পাবু একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ডাণ্ডার দিকে চলল। যেতে যেতে জেকবের কথাই ভাবছিল সে। লোকটি অদ্ভুত। এই বয়েসে, কোলাবার কাছে মাঝারি ধরনেব রেস্তোরাঁ ছিল তার। এক বন্ধুব সঙ্গে পার্টনারশিপে রেস্তোরাঁটা খুলেছিল সে। ছেলেবেলা থেকেই গান-বাজনার দিকে তার ঝোঁক, যে কোন তাবের বাজনা সে চমৎকার বাজাতে পারে। কাস্টমারদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচ আব বাজনার বাবস্থা ছিল জেকবদের রেস্তোরাঁয়। তাদের খদ্দেরদের বেশির ভাগই ছিল মার্চেণ্ট নেভির সেলার। ওরা চড়া ধবনেব উত্তেজক ওয়েস্টার্ন সোদিং- - কবত। জেকব কোনদিন বাজাতো ব্যাঞ্জো, কোনদিন বা স্ট্যাণ্ড থেকে যত উত্তবে ' স্নী বেবেন্স। শবীরের মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার ঢেকে জমজমাট নয়। . লোকজন বা।ও আর জেকবের সিন্ধী বন্ধু সুরেশ সিপ্পি কথন যেন সমুদ্রের তলা থেকে হলু ন্দা সবই থাকত তার কাছে। নির্জনতা, উল্টোপাল্টা হু-হু বাতাস, চাঁদ ন রেবেলা আর কোলাবার সেই কিছুই লক্ষ্য কর।ছল না পাবু। অন্যমনস্কের . আশ্চর্য, জেকব যাকে একদিন কানে এল, উল্টো।দক থেকে সেটা এগিয়ে আ স্ত্রী রেখে বিয়ে করেছিল সেই

রেবেকা সিপ্পির সঙ্গে জোট পাকিয়ে তাকে রেস্তোরাঁ থেকে বার করে দিয়েছিল। ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারত জেকব, অন্তত কোর্টেও সে যেতে পারত। কিন্তু স্ত্রী এবং বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা তাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

সে সময় দারুণ উদ্যম ছিল জেকবের, আর ছিল দুর্দান্ত কর্মশক্তি। ওরকম আরেকটা রেস্তোরাঁ সে অনায়াসেই খুলতে পারত, নতুবা যে কোন বড় হোটেলে মোটা মাইনের মিউজিক হ্যাণ্ডের একটা কাজ জুটিয়ে নেওয়াও ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছিল না তার।

কিছুদিন বম্বের রাস্তায় রাস্তায় লক্ষ্যহীনের মতো ঘুরে বেড়িয়েছিল জেকব। তারপর হঠাৎ একদিন ম্যাণ্ডোলিন গলায় ঝুলিয়ে চলে এসেছিল এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে।

সারাদিন মাউণ্ট মেরি চার্চের ওদিকটায় কোথায় যেন থাকে সে, সন্ধ্যের পর ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে এসে ম্যাণ্ডোলিন বাজায়। নিজের থেকে কারো কাছে কোনদিন একটা পয়সাও চায় না, কেউ কিছু দিলে না-ও বলে না। পাবু জানে, কোনদিন খাওয়াও জোটে না জেকবের। সেজন্য দুঃখ বা কষ্টবোধ নেই। সব ব্যাপারেই তার শান্ত উদাসীনতা।

কোস্ট ধরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পাবুর মনে হল জেকব আঙ্কলকে একটা টাকা দিলে হত, হয়তো আজ সারাদিনে তার খাওয়া হয় নি। পাবু তাড়াতাড়ি ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু না, জেকব নেই। তার ম্যাণ্ডোলিনের আওয়াজও আর শোনা যাচ্ছে না, নিশ্চয়ই অনেক দূরে চলে গেছে সে।

এলোমেলো ঘুরে বেশ রাত করে ফ্ল্যাটে ফিরে এল পাবু। এবার হরিশকে দেখা গেল। কুড়ি বাইশ বছরের লাল টুকটুকে গাড়োয়ালী, মোটা মোটা আঙুল, গোল মুখ, ছোট ছোট চাপা চোখ, মাথায় উলের টুপি, কোমরে টেঁটি ট্রাউজার আর হাতাওলা হলুদ গেঞ্জি। করিডরের বেসিনের কাছে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করছে।

হরিশটা সব সময় মজায় আছে। নিজেকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা সে আমোদে থাকতে পারে। পাবুকে দেখে হরিশ ছুটে এল। বলল, 'আ গিয়া দাদা—'

'হুঁ—' আবছাভাবে সাড়া দিয়ে ব্যাক বে'র দিকে তার নিজের ঘরে চলে গেল পাবু; গিয়েই ডিভানের ওপর জুতো-টুতো সুদ্ধু শুয়ে পড়ল।

হরিশ লাফাতে লাফাতে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। ডিভানের তলায় বসে পাবুর জুতো খুলে দিতে দিতে বলল, 'কিধার গিয়া থা দাদা?'

পাবু বলল, 'ডাণ্ডা—'

হরিশ বলল, 'দাদা, আজ ম্যাটিনী শো-মে সিনেমা দেখা—'

দুপুরে তাহলে সিনেমায় গিয়েছিল হরিশ। পাবু জিজ্ঞেস করল, 'কী সিনেমা দেখলি?'

হরিশ উৎসাহের গলায় বলল, 'বহুত আচ্ছা এক পিকচার।'

প্রচুর সিনেমা দেখে হরিশটা। পাবু ভেবে দেখল আজ পর্যন্ত কোন ছবিই খারাপ লাগে নি হরিশের। সিনেমা দেখে এসেই সে বলে, 'বহুত আচ্ছা দাদা, ফাইন—' কথার মধ্যে দু-চারটে ইংরেজি শব্দ জুড়ে দ্যায় সে।

হরিশ আবার বললে, 'অশোককুমার, বিন্দু, ধর্মেন্দর আউর হেমানে যো কিয়া না দাদা, ফাস্ট কিলাস।'

পাবু বলল, 'তাই নাকি?'

'হাঁ। খানাকা বাদ উনলোগকো অ্যাকটিং দেখাউঙ্গা।'

যে ছবিই দেখে আসুক হরিশ, আগাগোড়া সেটা অভিনয় করে পাবুকে দেখানো চাই। যে কোন অ্যাক্টর বা অ্যাক্ট্রেসকে চমৎকার নকল করতে পারে সে; আর নকল করার সময় খানিকটা ক্যারিকেচার মিশিয়ে দ্যায়। তাতে দারুণ মজা লাগে।

হরিশ বলল, 'খানা লাগাউঁ দাদা?'

পাবু অন্যমনস্কের মত বলল, 'দে'।

পাবুকে খেতে দিয়েই যে ছবিটা আজ ম্যাটিনী শো'তে দেখে এসেছে হরিশ, হাত পা ছুঁড়ে, গলার স্বর কখনও চড়ায় তুলে কখনও নামিয়ে তার অভিনয় শুরু করে দিল। এই সে অশোককুমার হয়, পরমুহূর্তেই ধর্মেন্দ্র, তারপরেই হেমা মালিনী কিংবা বিনোদ খান্না। এমন কি বিন্দু কিভাবে ক্যাবারে ড্যান্স করেছে তাও দেখিয়ে দিল।

হরিশের কাণ্ড কারখানা দেখে হেসে ফেলল পাবু। ছেলেটা তারই বয়েসী; দু-এক বছর বড়ও হতে পারে। পাবু যে দুঃখী এবং বিষণ্ণ, তার কারণটা হরিশের জানা। তাই সর্বক্ষণ তার কাজ হল পাবুকে হাসিয়ে আর মাতিয়ে রাখা। এই গাড়োয়ালী ছেলেটা যেন আরব সাগরের একমুঠো ফুরফুরে হাওয়া; পাবুর দুঃখ-টুঃখগুলো উড়িয়ে দিতে পারলেই সে খুশি।

ঘণ্টাখানেক নাচানাচি, লাফালাফি আর চিৎকারের পর হরিশ থামল।

ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল পাবুর ; টেবল থেকে উঠে সে করিডরে বেসিনের দিকে চলে গেল। তারপর মুখ-টুথ ধুয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

ডাইনিং রুম থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে হরিশ বলল, 'কেয়া দাদা, সো গিয়া ?'

পাবু বলল, 'হ্যাঁ রে—'

'হাম আভভি খানা খাকে আতা—'

পাঁচ মিনিটও লাগল না, খেয়ে-দেয়ে গেঞ্জির হাতায় মুখ মুছতে মুছতে পাবুর ঘরে চলে এল হরিশ। রাত্রে এ ঘরেই থাকে সে। যে কটটায় পাবু শোয় তার তলায় হরিশের বিছানা। সারা ঘরে প্রচুর জায়গা ; তবু পাবুর কটের তলায় না শুলে তার ঘুম হয় না।

হরিশ বলল, 'কাল বান্দ্রা টকীজমে এক নয়া পিকচার রিলিজ হোগী—'

হাত দিয়ে চোখ ঢেকে আবছা গলায় পাবু বলল, 'হুঁ—'

'উসমে হেমা হায়। সঞ্জীবকুমার আউর্ শটগান শত্রুঘন ভি হায়। তুম যাওগে দাদা ?'

পাবু উত্তর দিল না।

হরিশ কি ভেবে নিয়ে বলল, 'কিয়া দাদা, নিদ আ গয়ী ?'

পাবু বলল, 'হুঁ—'

'বাতি বুতা (নিভিয়ে) দুঁ ?'

'দে।'

আলো নিভিয়ে হরিশ কটের তলায় ঢুকল। ওখানে বিছানা পাতাই থাকে। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর কটের তলা থেকে হরিশ ডাকল, 'দাদা—'

'বল—'

'মেমসাব তো এখনও ফিরল না।'

মেমসাব অর্থাৎ মা। মা'র কথা উঠলেই পাবুর চোখ-মুখ কঠিন হয়ে ওঠে, অসহ্য এক বিতৃষ্ণা অনুভব করে সে। হরিশের কথার জবাব দিল না পাবু।

হরিশ আবার বলল, 'কব লোটেগী, মেমসাব খবর ভেজা ?'

বিরক্ত স্বরে পাবু বলল, 'বকবকানি থামা হরিশ, ঘুমোতে দে।'

'আচ্ছা দাদা, আচ্ছা—'

সত্যি সত্যিই ঘুম পাচ্ছিল না পাবুর ; রাত্রিবেলা সহজে তার ঘুম আসে না। শোবার পর অনেকক্ষণ জেগে থেকে সে ছটফট করে।

বাইরে সী সাইড রোড এখন নির্জন হয়ে গেছে। বাস, ট্যাক্সি আর

প্রাইভেট কারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। এখন শুধু অশ্রান্ত সমুদ্রগর্জন আর বাতাসের শব্দ। বাণ্ড স্ট্যাণ্ডের উঁচু উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট হাউসগুলোর আলো নিভে যাচ্ছে। মাহিম ক্রীক কিংবা ওর্লি সী ফেসের দিকটায় ক্বচিৎ এক আধটা আলো জ্বলছে। যে বম্বে সারাদিন স্পীড এক্সাইটমেন্ট আর হাজার রকম ধান্দার পিছনে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে থাকে এই গাঢ় রাতে ঘুমের আরকে সে ডুবে যাচ্ছে।

হঠাৎ কটের তলা থেকে হরিশ আবার ডেকে উঠল, 'দাদা—' সে জানে শোয়ামাত্রই পাবুর ঘুম আসে না।

পাবু জিজ্ঞেস করল, 'কী বলছিস ?'

'তোমাকে একটা খবর দিতে বিলকুল ভুলে গিয়েছিলাম।'

'কী খবর রে ?'

'আমাদের ওধারের বগলবালা ফ্ল্যাটে আজ নয়া আদমি এসেছে।' বলতে বলতে কটের তলা থেকে মুণ্ডু বাড়াল হরিশ।

সেই অল্পবয়সী মেয়েটা আর তার মধ্যবয়সী সঙ্গীর কথা ঝট করে মনে পড়ে গেল পাবুর। সে বলল, 'তাই নাকি ?'

হরিশ বলতে লাগল, 'এক লড়কী যো আয়ী না, জরুর উও ফিল্মস্টার বনেগী।'

'ফিল্মস্টার বনেগী ?'

'হাঁ দাদা। তুম উসে দেখা ?'

পাবু ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল, 'না।'

হরিশ বলল, 'যব দেখোগে মেরা বাত মান যাওগে।'

হরিশটাকে এখন না থামালে সমস্ত রাতই হয়তো বকবক করে যাবে।

পাবু বলল, 'ঠিক আছে। তুই এখন ঘুমো—'

কটের তলায় হরিশ আবার তার মুণ্ডুটা ঢুকিয়ে নিল।

পাশের ফ্ল্যাটের সেই মেয়েটা এবং তার সঙ্গীর মুখ আগ্রহশূন্য ভাবে ভাবতে চেষ্টা করল পাবু। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

কলিং বেলের শব্দে একসময় ঘুমটা ভেঙে গেল পাবুর। একটানা কর্কশ আওয়াজটা বেজেই যাচ্ছে। ঘুম চোখে প্রথমটা মনে হচ্ছিল বেলটা বাজছে পাশের ফ্ল্যাটে। একটু পরেই ঘুমের চটকা পুরোপুরি কেটে গেলে পাবু বুঝতে পারল, না, তাদেরই ফ্ল্যাটে বাজছে।

পাবু কটের তলায় ঝুঁকে ডাকল, 'হরিশ, হরিশ—'

হরিশের সাড়া নেই।

পাবু আবার ডাকল। এবারও হরিশের ঘুম ভাঙার লক্ষণ নেই। ছোকরার সব ভাল, কিন্তু একবার ঘুমোলে ঘাড়ে করে সী সাইড রোডে ফেলে দিয়ে এলেও জাগবে কিনা সন্দেহ।

আরো বারকতক ডাকাডাকি করে শেষ পর্যন্ত খুবই বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল পাবু। করিডরের আলো জেলে বাইরের দিকের দরজা খুলতেই চমকে উঠল। তার মা আর সেই লোকটা—ব্রিজেশ সিং—দাঁড়িয়ে আছে।

মা ঠিক দাঁড়িয়ে নেই, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থা নয় তার। মা টলছিল; চোখ মুখ আরক্ত; নিচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। মুখ থেকে ভক ভক করে হুইস্কির গন্ধ আসছিল তার। বুকের ওপর কাপড় নেই; শাড়িটা লুটোচ্ছে। কোমরের কাছেও বাঁধনটা ঢিলে হয়ে পেটিকোটের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। মা যাতে পড়ে না যায় ব্রিজেশ সিং, সেই বাস্টার্ডের বাচ্চাটা তাকে ধরে রেখেছে।

মা'র বয়স চল্লিশ-বেয়াল্লিশ; গায়ের রঙ লালচে হলুদ। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি হাইট, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বাদামী চুল, বড় বড় চোখ, ধারালো নাক, ডিমের মতো মুখ। পরনে ব্রা-টাইপের ব্লাউজ আর দামী শিফন।

প্রচুর ড্রিংক করে মা; তবু কি এক আশ্চর্য কৌশলে শরীরে এক গ্রামও অ্যালকোহলিক ফ্যাট জমতে দ্যায় নি। খুব কাছে না গেলে তার বয়স বুঝবার উপায় নেই।

মার সঙ্গী ব্রিজেশ সিং-এর চেহারা ভারী ধরনের; হেফটিই বলা যায়। লোকটা পাঞ্জাবী হিন্দু। চৌকো টাইপের দৃঢ় মুখ। কাটা-কাটা নাক, চিবুক। ব্রোঞ্জের মতো গায়ের রঙ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। সুকৌশলে কিছু চুল ডাই করে রেখেছে; তাতে তাকে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় মনে হয়।

ওদের দেখতে দেখতে সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে গেল পাবুর।

ব্রিজেশ বলল, 'পাবু, প্লীজ হেল্প হার। শোভা আজ ভীষণ আউট হয়ে গেছে।'

মা'র নাম শোভা। পেটে দু-চার ফোঁটা হুইস্কি পড়লেই মা আউট হয়ে যায়। তবু ড্রিংক করা তার চাই-ই। যেদিন ফ্ল্যাটে বসে খায়, সেদিন আউট হয়ে ফ্লোরে পড়ে থাকে। আর যেদিন বাইরে খায় সেদিন ব্রিজেশ তাকে ঘাড়ে করে ফ্ল্যাট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।

পাবু উত্তর দিল না; স্থির পলকহীন তাকিয়ে রইল।

ব্রিজেশ আবার বলল, 'পাবু, প্লীজ মাই বয়, শোভাকে একটু ধর! ওকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া দরকার—'

রুক্ষ চাপা গলায় পাবু বলল, 'আই কাণ্ট! আমাকে দিয়ে এসব হবে না—' বলেই নিজের ঘরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

ব্রিজেশও প্রচুর ড্রিংক করেছিল, কিন্তু সে একেবারে মা'র উল্টো। পাবু আগেও দেখেছে, দশ বারো পেগ হুইস্কি কি ফেনী টানবার পরও তার মাথা কোয়ার্টার ইঞ্চিও টলে না; চোখ দুটো সামান্য লালচে হয় মাত্র। আর ড্রিংক করলে লোকটা দারুণ সোবার হয়ে যায়। তখন সে বিনয়ী, ভদ্র এবং আশ্চর্য স্নেহপরায়ণ।

ব্রিজেশ বলল, 'পাবু—ডার্লিং, ডোণ্ট বী ক্রুয়েল। আফটার অল শোভা তোমার মা; সে অসুস্থ! কাম অন মাই বয়—'

দাঁতে দাঁতে চাপল পাবু। কিন্তু আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পায়ে নিজের ঘরে এসে কটের ওপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়েই সে লক্ষ্য করল মা'র হাত নিজের কাঁধে তুলে এবং একটা হাত দিয়ে মা'র কোমর বেষ্টন করে আলোকিত করিডর ধরে ব্রিজেশ তাকে ওধারের ঘরটায় নিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর মাকে কি যেন বলতে লাগল। মাও জড়ানো গলায় কি উত্তর দিল, কিন্তু ওদের কথাবার্তার একটা বর্ণও বুঝতে পারল না পাবু।

মা কিংবা তার সঙ্গী ওই লোকটা, কারোকেই সে পছন্দ করে না। তাদের ঘৃণাই করে পাবু—তীব্র, প্রচণ্ড ঘৃণা।

কিছুক্ষণ পর আচমকা খুট করে এ ঘরে কেউ সুইচ টিপল; সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভরে গেল। চমকে ঘাড় ফেরাতেই পাবু দেখল, সেই লোকটা—ব্রিজেশ, তার ঘরে এসেছে।

ব্রিজেশ তার ঘরে পারতপক্ষে আসে না; পাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

কটের ওপাশে সেই ডিভানটায় গিয়ে বসল ব্রিজেশ। দ্বিধাদ্বিতের মতো

বলল, 'যাক, ঘুমিয়ে পড় নি।'

পাবু চুপ।

ব্রিজেশ আবার বলল, 'মহাবলেশ্বর থেকে রাত ন'টার সময় আমরা ফিরে এসেছিলাম'। শোভা বলল, 'এত রাতে হরিশটাকে ট্রাবল দিয়ে দরকার নেই। বাইরে কোন রেস্তোরাঁ থেকে খেয়ে যাব।'

পাবু এবারও কিছু বলল না।

ব্রিজেশ কয়েক পলক পাবুকে লক্ষ্য করল; তারপর পায়ের ওপর পা তুলে শুরু করল, 'আমি বলেছিলাম বাইরে খাবার কি দরকার, হরিশের যদি একটু কষ্ট হয় হবে। ফর দ্যাট হী ইজ হীয়ার। পয়সা দিয়ে লোক রাখা তবে কেন? কিন্তু কে কার কথা শোনে। শোভা বাইরে খাবার জন্য ক্ষেপে উঠল। তোমার মা'র জেদ তো জানো; সে যা বলবে তাই করতে হবে। অ্যাণ্ড হোয়াট আই ফীয়ার্ড, রেস্তোরাঁয় গেলে শুধু খাবারই খাবে না, ড্রিংকও করবে। ইউ নো পাবু, ড্রিংক করলে শোভা কী হয়ে যায়।'

পাবু হঠাৎ ব্রিজেশের কথার মধ্যেই বলে উঠল, 'আই অ্যাম টায়ার্ড অফ ইউ। আমার কাছে এসব কৈফিয়ৎ দিতে হবে না।'

ব্রিজেশ থতিয়ে গেল, 'যাক গে। তুমি যথেষ্ট বড় হয়েছ; সবই জানো—'

বলার পরও ওঠার নাম নেই লোকটার। রাত দুপুরে তার ঘরে হানা দেবার মানে কী? চোখ কুঁচকে পাবু বলল, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে—'

ব্রিজেশ এবার ব্যস্তভাবে উঠে পড়ল, 'তোমাকে আর ডিস্টার্ব করব না; আমি যাচ্ছি।' পা বাড়িয়েও সে কিন্তু গেল না।

পাবু বলল, 'কিছু বলবার আছে?'

ব্রিজেশ বলল, 'সেই মহাবলেশ্বর থেকে আসছি; রাতও প্রায় একটা বাজতে চলল। আই অ্যাম এক্সট্রিমলি টায়ার্ড। তুমি যদি পারমিশন দাও আজকের রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাই; কাল ভোরবেলা চলে যাব। এত রাত্রে সেই পেডার রোডে যাওয়া—'

দ্রুত বিছানায় উঠে বসল পাবু। চিৎকার করে বলল, 'না; কিছুতেই না। প্লীজ গেট আউট।' উত্তেজনায় তার গলার শির ফুলে উঠছিল।

'ডোন্ট বী এক্সাইটেড পাবু। প্লীজ, তুমি যখন চাও না, আমি চলেই যাচ্ছি। এত রাত্রে কষ্ট হয়তো একটু হবে; তা আর কী করা যাবে—' ব্রিজেশ সত্যি সত্যিই চলে গেল, একটু পর বাইরের দিকের দরজা টেনে দেবার শব্দ হল।

ব্রিজেশ চলে যাবার পরও অনেকক্ষণ বসে থাকল পাবু। তার ঘরে, মা'র

ঘরে এবং প্যাসেজে আলো জ্বলছে। জ্বলুক। তার মাথার ভেতর কোন এক বারুদের স্তূপে যেন বিস্ফোরণ ঘটে গেছে। এই ফ্ল্যাটে রাত কাটাতে চায়; লোকটার এত বড় দুঃসাহস কোত্থেকে হল? কবেই তো পাবু তাকে বলে দিয়েছে, আর যা-ই কর, রাতে এখানে থাকা চলবে না। মনে মনে সে উচ্চারণ করল, 'ব্লাডি সোয়াইন—'

অনেকক্ষণ পর উত্তেজনাটা থিতিয়ে এলে উঠে গিয়ে চারদিকের আলো নিভিয়ে এসে শুয়ে পড়ল পাবু। শুয়ে পড়ল কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। চোখের ভেতরটা জ্বালা করছে। কপালের শিরা দুটো সমানে লাফিয়ে যাচ্ছে। গলার কাছটা শুকনো; ব্লটিং পেপার দিয়ে কেউ যেন সব থুতু শুষে নিয়েছে। ব্রিজেশ সিং তার মেজাজটা খারাপ করে দিয়ে গেছে।

বিছানায় কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে একসময় উঠে পড়ল পাবু। হরিশ মাথার কাছে একটা টীপয় টেবলে রোজ রাত্তিরে খাবার জল রাখে। পাবু উঠে গিয়ে এক গেলাস জল খেল; তারপর দরজা খুলে সমুদ্রের দিকের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল।

বাইরে আরব সাগরের হু-হু হাওয়া। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে মুখে, মাথায়, সারা গায়ে। অন্ধকারে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের জীবনের সব কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল পাবুর।

খুব ছেলেবেলার কথা জানে না।

সাত আট বছর বয়েস থেকে সব পরিষ্কার মনে আছে পাবুর। ওরা থাকত খার ওয়েস্টে, আম্বেদকর রোডের একটা ফ্ল্যাট বাড়িতে। তখন খারের ওদিকটা, শুধু খার কেন, খারের পাশাপাশি বান্দ্রা, পালি হিল বা সমুদ্রতীরের এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড, কোনটাই এখনকার মতো এত জমজমাট হয়ে ওঠে নি। খার, বান্দ্রা, ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড তো এখন রীতিমত 'পশ' এরিয়া। এ জায়গাগুলো ফিল্মস্টার আর পয়সাওলা আপস্টার্টদের কলোনি হয়ে উঠেছে। আজকাল যেদিকেই চোখ ফেরানো যাক শুধু অ্যাপার্টমেণ্ট হাউস নতুবা আলট্রা-মডার্ণ আমেরিকান আর্কিটেকচারের বাংলো। চোদ্দ পনের বছর আগে, পাবুর সেই ছেলেবেলায়, প্রপার বম্বে থেকে ষোল আঠারো কিলোমিটার দূরে খারের শহরতলীতে ফাঁকা জায়গাই ছিল বেশি, আর ছিল প্রচুর গাছপালা। তার ফাঁকে ফাঁকে সবে নতুন নতুন বাড়ি উঠতে শুরু করেছে, বম্বেতে তখন হু-হু করে মানুষ-বাড়ছে, পপুলেশন এক্সপ্লোসান যাকে বলে। প্রপার সিটিতে আর জায়গা হচ্ছিল না, তাই শহর

ছাপিয়ে মানুষ আউট স্কার্টগুলোতে অর্থাৎ খার-টারের দিকে ধাওয়া করেছিল। খারে নতুন নতুন বাড়ির পাশে জেলেদের বস্তিও ছিল অনেক। তবে এদিকটায়, সমুদ্রের পাড়ে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে আর মাউন্ট মেরি চার্চের চারধারে বড়লোকদের কিছু কিছু বাংলো আগে থেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

মনে পড়ে তাদের ফ্যামিলি ছিল খুবই ছোট্ট—বাবা, মা আর সে। তিনটি মানুষের সংসার অনায়াসেই সুখের হতে পারত। কিন্তু সেই অল্প বয়েসেই পাবু লক্ষ্য করেছে বাবার সঙ্গে মার বনিবনা ছিল না; চোখাচোখি হলেই ওদের খিটিমিটি বেধে যেত। দু'জনের সম্পর্ক ছিল নিয়ত যুদ্ধের।

খিটিমিটি হতে হতে একদিন হয়তো প্রচণ্ড ঝগড়া হয়ে যেত মা আর বাবার। তারপর দু-এক সপ্তাহ কথা বন্ধ। বাড়ির আবহাওয়া তখন আরো বিষাক্ত হয়ে থাকত।

জ্ঞান হবার পর থেকে মা বাবাকে কোনদিন হাসি-ঠাট্টা করতে দ্যাখে নি পাবু। হাল্কা মেজাজে দুজনে গল্প-টল্প করছে, এমন দৃশ্য তার মনে পড়ে না। সব সময় ওরা যেন কামানে বারুদ পুরে অপেক্ষা করত। ওদের সম্পর্কটা যে কেন এইরকম সেই বয়েসে বুঝবার কথা নয় পাবুর।

নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে করতে পাবুর দিকে ওদের লক্ষ্য ছিল না। মা বা বাবা, কেউ তার সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলত না। আদর-যত্ন ছাড়াই আগাছার মত সে বড় হয়ে উঠেছিল।

মনে পড়ে বাবা বম্বের খুব বড় একটা ফার্মে ছোটখাটো চাকরি করত। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি শেভ আর স্নান সেরে ব্রেকফাস্ট করেই খার স্টেশনে ছুটত; ওখান থেকে সাবার্বন ট্রেন ধরে বম্বে। যেদিন মা'র সঙ্গে ঝগড়াটা বেশি রকম হত সেদিন বাড়িতে আর ব্রেকফাস্ট করত না। স্নান-টান সেরেই বেরিয়ে যেত।

বাবা চলে যাবার পর তার পালা। স্নান করে, খেয়ে, স্কুল-ড্রেস পরতে না পরতেই সান্টাক্রুজ মিশনারি স্কুলের বাস এসে যেত।

যতক্ষণ স্কুলে থাকত ততক্ষণই ভাল। অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো হৈ-চৈ করে সময়টা কেটে যেত।

স্কুল ছুটির পর বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে খুব বিষণ্ণ হয়ে যেত পাবু। যতক্ষণ সে বাড়ি থাকত, সময় যেন আর কাটতে চাইত না।

বিকেলে বাড়ি ফিরে কোনদিন সে দেখত, মা জানলার পাশে চুপচাপ বসে আছে; কোনদিন বা মা শুয়ে থাকত।

কদাচিৎ এক-আধদিন মা তাকে দেখে উঠে আসত ; স্কুলের ড্রেস ছাড়িয়ে হাত-মুখ ধুইয়ে খেতে দিত। তবে বেশির ভাগ দিনই মা তাকে দেখেও দেখত না ; পাবুও ডাকাডাকি করত না। নিজেই স্কুল-ইউনিফর্ম বদলে কিচেনে চলে যেত ; সেখানে তার জন্য খাবার ঢাকা দেওয়া থাকত।

তাদের সেই আম্বেদকর রোডের ফ্ল্যাটটা ছিল খুবই ছোট্ট। দুটো ঘর, এক ফালি প্যাসেজ, জানলাহীন কিচেন আর বাথরুম। ফ্লোর এরিয়া সব মিলিয়ে পাঁচশো স্কোয়ার ফুটও হবে না। প্রকাণ্ড এক বাড়ির পেটের ভেতর তাদের ফ্ল্যাটটা এমন জায়গায় ছিল যেখান থেকে আকাশ চোখে পড়ত না। চারদিকে শুধু দেয়াল আর দেয়াল। নামেই ফ্ল্যাট ; নইলে ঘিঞ্জি 'চাওলে'র চাইতে এমন কিছু ভাল ছিল না। সেই সংক্ষিপ্ত দমবন্ধ জায়গাটুকুর মধ্যে কিছুক্ষণ ইঁদুরের মতো একা একা ঘোরাঘুরি করতে না করতেই সন্ধ্যে নেমে যেত।

পাবুর মনে পড়ে, কচিৎ কখনো স্কুল থেকে ফেরার পর মা হঠাৎ বলত, 'এই পাবু বেড়াতে যাবি ?'

পাবু প্রথমটা অবাক, তারপরেই নেচে উঠত, আম্বেদকর রোডের ফ্ল্যাট বাড়িটা তার একেবারেই ভাল লাগত না। জলজ্বলে চোখে মা'র দিকে তাকিয়ে সে ঘাড় হেলিয়ে দিত, 'হুঁ—কোথায় বেড়াতে যাবে মা ?'

'ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে—'

দু মিনিটের মধ্যে সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে মা'র সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত পাবু।

আম্বেদকর রোড থেকে নিরিবিলি ছায়াচ্ছন্ন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ওরা চলে আসত হিল রোডে, সেখান থেকে বাস ধরে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড।

সমুদ্রের পাড়ে এলোমেলো ঘুরে বেড়াত ওরা। এইখানেই জেকবের সঙ্গে ওদের আলাপ। গোয়ান পিজ্রু জেকব ষোল-সতের বছর আগে এত বুড়ো হয় নি ; রীতিমতো শক্ত-সমর্থ মজবুত চেহারা তখন তার। মাথা নীচু করে ম্যাণ্ডোলিন বাজাতে বাজাতে সী সাইড রোড ধরে হেঁটে যেত।

সমুদ্রের পাড়ে খানিকক্ষণ ঘুরবার পর মা হঠাৎ বলত, 'চল পাবু, মাউণ্ট মেরি চার্চে যাই।'

পাবুর তাতে আপত্তি নেই। বলত, 'চল—'

উঁচু চড়াই বেয়ে মা'র সঙ্গে মাউণ্ট মেরিতে চলে যেত পাবু।

বম্বের মত উত্তেজনাময় ভিড়ের শহরে এমন নির্জন স্নিগ্ধ পবিত্র একটা জায়গা থাকতে পারে, ভাবাই যায় না। চার্চে গিয়ে পাবু এধারে-ওধারে ঘুরে ঘুরে দেখত। মা কিন্তু সোজা অলটারে গিয়ে মেরি মূর্তির দিকে পলকহীন তাকিয়ে

থাকত; এই সময়টা মাকে অলৌকিক আর আশ্চর্য অচেনা মনে হত। মনে হত, মা যেন এ জগতের কেউ না। কোনদিন পাবু লক্ষ্য করেছে, মা'র চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

পাবু কাছে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে ডাকত, 'মা, মা—'

মা চমকে উঠত, 'কী বলছিস?'

'তুমি কাঁদছিলে?'

দ্রুত চোখ মুছে নিয়ে মা অদ্ভুত হাসত, 'কই না; কাঁদব কেন?'

মা'র এই অদ্ভুত আচরণের কারণ সেদিন বুঝতে পারত না পাবু। বুঝবার কথাও নয়। অবশ্য বড় হয়ে নিজের মতো করে সে খানিকটা অনুমান করে নিয়েছে। কিন্তু সে-সব পরের কথা।

মনে পড়ে ব্যাণ্ড স্টাণ্ডে বেড়াতে এলে মা একবার মাউন্ট মেরীতে যেতই। তবে বেশি রাত পর্যন্ত থাকত না, অন্ধকার নামলেই আবার তাকে নিয়ে খারে ফিরে যেত।

মা আর ক'দিনই বা তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরুত! মাসে একদিন কি বড়জোর দু দিন। সেই দুটো একটা দিনই কি ভাল যে লাগত। নইলে অন্য সব দিন স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে একা একা কিছুক্ষণ ঘুরে সন্ধ্যে হলেই বই-টই নিয়ে বসে পড়ত পাবু।

স্কুলটা ছিল তাদের চমৎকার; যা কিছু পড়া মিস'রা ক্লাসেই করিয়ে দিত। তবু সন্ধ্যেবেলা বইগুলো একটু নাড়াচাড়া না করতে পারলে ভাল লাগত না পাবুর। বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই চোখ জুড়ে ঘুম এসে যেত। আর মা তখন তাকে খাইয়ে শুইয়ে দিত।

শোবার সঙ্গে সঙ্গেই পাবু ঘুমিয়ে পড়ত। তবে মাঝে মধ্যে এক আধদিন ঘুম আসত না। যেদিন সে জেগে থাকত সেদিন শুয়ে শুয়েও টের পেত, অনেক রাত্তিরে বাবা ফিরে এসেছে। অবশ্য সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় না। এই বম্বে সিটি তখন ড্রাই এরিয়া; কিন্তু প্রহিবিসন অ্যাক্টের ঘাড়ে তিনটে বুটের ঠোক্কর দিয়ে চুর মাতাল হয়ে ফিরত বাবা; চোখ তখন তার টকটকে লাল; মাথা টলত। বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে যেত পাবু; দম বন্ধ করে চোখ বুজে পড়ে থাকত সে; নড়াচড়া করতেও সাহস হত না। পাবু শুনতে পেত, মা বলছে, 'আবার ড্রিংক করে এসেছ?'

বাবা জড়ানো স্বরে বলত, 'ড্রিংকটা তো করবার জন্যেই ডার্লিং—'

মা বলত, 'তোমার লজ্জা করে না! রোজ রোজ মাতাল হয়ে ফের।'

বাবা এবার হেসে ফেলত, 'তুমি বড় পিউরিটান শোভা: ওয়ার্ল্ডের কোন খবরই রাখো না।'

মা চুপ। না তাকিয়েও পাবু অনুভব করত, মা দাঁতে দাঁত চেপে আছে।

বাবা আবার বলত, 'তুমি কি জানো ডার্লিং, প্রহিবিসনের আগে এই বম্বে সিটিতে ফরটি পারসেন্ট লোক মদ খেত, এখন খাচ্ছে নাইনটি পারসেন্ট।'

মা তীব্র চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠত, 'আমি জানি না। জানতেও চাই না।'

রাত্তিরে পেটে কয়েক ফোঁটা হুইস্কি, ফেনী বা ঠাবুরা পড়লে বাবা আশ্চর্য রকম সোবার হয়ে যেত; তখন মনে হত স্বর্গ থেকে দেবদূত নেমে এসেছে। বাবা বলত, 'জানব না বললে তো হবে না; জানতেই হবে। বম্বে শহরে থাকবে, আর এখানকার খবর রাখবে না, সেটা তো হতে পারে না। তুমি তাহলে এ শহরে থাকার আযোগ্য। টোটালি আনফিট।' বলতে বলতে বাবার হেঁচকি উঠে যেত।

পাবু অনুভব করত, রাগে ঘৃণায় মা'র চোখ জ্বলছে।

বাবা কিন্তু থামত না, সমানে বকে যেত, 'আমাদের এটা কী ধরনের দেশ বল তো ডার্লিং?'

ড্রিংক থেকে দেশের প্রসঙ্গ আসাতে মা অবাক। তবু রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করত, 'কী ধরনের বলতে?'

'আই মীন পলিটিক্যালি—'

'তোমার আবোল-তাবোল কথা বুঝি না।'

বাবা বলত, 'ও-কে, বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ইণ্ডিয়া হল ডেমোক্র্যাটিক কাণ্ট্রি। মেজরিটি যা বলবে, যা করবে আমি তো তার বাইরে কিছু করতে পারি না। আফটার অল আই অ্যাম এ জেনুইন লয়াল সিটিজেন। এই বম্বের নাইনটি পারসেণ্টের মনে কষ্ট দিয়ে কি টেন পারসেন্টকে ওবলাইজ করা উচিত হবে?'

মা চিৎকার করে উঠত, 'চুপ কর, প্লীজ চুপ কর।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চুপই করছি। রাত বোধহয় অনেক হয়েছে, না?'

'তোমার কী মনে হয়?'

হাত উল্টে ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করত বাবা; রক্তাভ ঘোলাটে চোখে কাঁটাগুলো ঠিক কোন্ ঘরে আছে খুঁজে না পেয়ে বলত, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। এনি ওয়ে, ধরেই নেওয়া যাক, বেশ রাত হয়েছে।' একটু ভেবে খানিকটা আপন মনে আবার বলত, 'চারটের সময় অফিস ছুটি হয়েছিল, ওখান থেকে গিয়েছিলাম মালাবার হিল্সে। সেখান থেকে মহালছমী; তারপর বান্দ্রার এক ফ্ল্যাটে,

সেখানে কেনী খেলাম ; ড্রিংক-ট্রিংক করে বাড়ি আসছি।' মাথা নেড়ে নেড়ে বলত, 'এতগুলো কাজ সারতে কয়েক-ঘণ্টা সময় তো লাগবারই কথা। স্যাট মীন্‌স্‌ রাত বেশ ভালই হয়েছে। কাজেই এখন খাওয়া দরকার, এবং তারপর শোয়া।'

খেতে বসে বাবার নেশাটা হয়তো ফিকে হয়ে আসত। বলত, 'তারপর কী ঠিক করলে ডার্লিং?'

মা রুদ্ধ স্বরে বলত, 'কী ব্যাপারে?'

'বা রে, ভুলে গেছ! রোজ হাজারবার করে কথাটা বলছি।'

মা চুপ।

বাবা মা'র দিকে ঝুঁকে বলত, 'তুমি রাজী হয়ে যাও শোভা—'

মা ঝাপসা গলায় বলত, 'না ; অসম্ভব।'

'তুমি আমার ওপর অবিচার করছ শোভা।'

'আমি অবিচার করছি? তোমার ওপর? চমৎকার!'

বাবা বোঝাতে চেষ্টা করত, 'আহা, ব্যাপারটা এত সীরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? ইট ইজ নাথিং ; কিছুই না।'

মা অদ্ভুতভাবে উচ্চারণ করত, 'নাথিং—কিছুই নয়!'

'নয়ই তো।' বাবা শব্দ করে হেসে উঠত, 'আরে বাবা, আমাদের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সায়গল সাহেবের সঙ্গে গাড়িতে দু-চারদিন ঘুরে বেড়াবে ; এক আধদিন সে হয়তো তোমাকে নিয়ে যাবে ক্লাব কিংবা হোটেলে। সায়গল ইজ এ নাইস ফেলো ; সুন্দরীদের ভদ্রলোক দারুণ পছন্দ করে। আর নিজের বউ বলে ফ্লাটারি করছি না, তুমি তো রীতিমত চার্মিং। আই অ্যাম মোর স্থান সিওর তোমাকে দেখলে স্যাট সায়গলের মুণ্ডু বিলকুল ঘুরে যাবে।' বলতে বলতে এঁটো হাতেই বাবা মা'র গাল টিপে দিত।

সারাক্ষণ যে চোখ বুজে পড়ে থাকত, এমন কথা বলতে পারে না পাবু। মাঝে মধ্যে চোখের পাতা ফাঁক করে নিশ্চয়ই সে মা বাবাকে দেখেছে।

ধাক্কা দিয়ে বাবাকে সরিয়ে দিতে দিতে মা বলত, 'রোজ রোজ ওই সায়গলের কথা আমাকে বলবে না।'

'তুমি যতদিন না আমার প্রোপোজালে রাজী হচ্ছ, আমাকে বলতেই হবে।'

'আমার কথা তোমাকে তো কতবার বলেই দিয়েছি।'

বাবা তবু চেষ্টা করে যেত, 'আরে বাবা, তোমার এত ছুঁচিবাই কেন? ওয়ার্ল্ড ইজ চেঞ্জড এ লট শোভা, আমার কলীগদের কথাই ধর না—ওই শেঠি, রাও, মাত্রে—ওদের বৌরা সায়গল সাহেবের সঙ্গে ক্লাবে হোটেলে ক'দিন ঘুরল,

তারপরেই ওরা বড় বড় প্রমোশন, মোটা মোটা মাইনে বাগিয়ে নিল। তুমি আমাকে একটু হেল্প করবে না?'

মা উত্তর দিত না।

বাবা বলেই যেত, 'এই বম্বে সিটির দিকে তাকাও। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চারদিকে টাকা উড়ছে; অথচ আমি ধরতে পারছি না। ভাবতে গেলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়।'

'কী হবে বেশি টাকা দিয়ে?'

'বেশি টাকা মানে বেশি সুখ। মানি ক্যান বায় এভরিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড।' বাবা যেন নিশি পাওয়া মানুষের গলায় বলে যেত, 'তুমি তো জানোই আমি অ্যাম্বিসাস। আমি বড় হতে চাই শোভা, অনেক অনেক বড়। শুয়োরের খোঁয়াড়ের মত এই বাড়িতে থাকতে চাই না। পেডার রোডে কি মালাবার হিল্‌সে আমার প্রকাণ্ড ফ্ল্যাট হবে, ফ্লীট অফ কারস্ থাকবে, বয় বাবুর্চি গভর্নেস—আমি এ সবের স্বপ্ন দেখি। তুমি শুধু প্রাইমারি স্টেজে আমাকে একটু করুণা কর। বাকিটা আমি করে নেব।'

মা খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে বলত, 'আমরা তো এখানে ভালই আছি। কী দরকার পেডার রোড আর মালাবার হিল্‌সের স্বপ্ন দেখে—'

বাবা বলত, 'তুমি টিপিক্যাল মিড্‌ল ক্লাস। বড় সুখ, বড় স্বপ্নের কথা ভাবতে পারো না।'

'মিড্‌ল ক্লাসই তো। বড় বড় স্বপ্ন দেখে মাথা খারাপ করে কী লাভ?'

'আহা, আমার কথা বুঝতে পারছ না কেন? আমি চাই ভালভাবে বাঁচতে। যাকগে, কবে সায়গল সাহেবের কাছে যাবে বল। প্লীজ—'

মা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলত, 'তোমার কি ধারণা তোমার সায়গল সাহেবের সঙ্গে ঘুরলেই সে খুশি হয়ে যাবে? আর কিছু চাইবে না?'

বাবা চাপা গলায় বলত, 'যদি চায়ই তাতে অসুবিধাটা কী। বাড়ি এসে তিনবার চান করে নিও; গায়ে দাগও থাকবে না। তুমি আবার অ্যাজ পিওর অ্যাজ বিফোর।' কথা বলতে বলতে গলার স্বর অতলে নেমে যেত বাবার, 'তুমি সাফিসিয়েন্টলি ইন্টেলিজেন্ট শোভা। যে লোকটা আমাকে দু' হাজার টাকার চাকরিতে প্রোমোশান দেবে সে কি কিছু না নিয়েই দেবে! গিভ এণ্ড টেক—টেক এ্যাণ্ড গিভ—এই হচ্ছে ওয়ার্ল্ড।'

মা দু-হাতে মুখ ঢেকে জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে থাকত, 'না না, আমি পারব না, পারব না, পারব না—'

বাবা বলত, 'ওল্ড ভ্যালুজগুলোকে মাথা থেকে বার করে দাও তো। মানুষ সুখের জন্য সব পারে। তোমাকেও পারতে হবে, পারতেই হবে।'

মা একটানা বৃষ্টির শব্দের মতো বলে যেত, 'পারব না, পারব না, পারব না—'

মা আর বাবার এইসব কথার গভীর অর্থ সেই বয়েসে বুঝবার কথা নয় পাবুর। বড় হয়ে সে বুঝেছে এই বম্বে শহর বাতাসে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে বাবাকে পাগল করে দিয়েছিল। চারদিকে এত অ্যাফ্লুয়েন্স, এত পর্যাপ্ত আরাম, এত সুখের উপকরণ; তবে সবই তার নাগালের বাইরে। বাবা বম্বে ইউনিভার্সিটির সামান্য গ্র্যাজুয়েট; ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউণ্ড বলতে কিচ্ছু নেই। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে বাবার উচ্চাশা ছিল প্রচণ্ড; আর তার সেই অ্যাম্বিশানকে ক্রমাগত উস্কে দিচ্ছিল এই বম্বে শহর। কিন্তু চারধারের অ্যাফ্লুয়েন্সকে হাতের মুঠোয় সে পুরবে কিভাবে? সে যোগ্যতা বা ক্ষমতা তার কোথায়? কাজেই সোজা রাস্তাটাই সে ধরেছিল। ক্যাপিটাল বলতে তার একটিই—ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। তাকে ভাঙিয়েই সে সুখ কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু এসব পাবুর বড় বয়সের ভাবনা।

যাই হোক, সেই ছেলেবেলায় যেদিনই সে জেগে থাকত একই দৃশ্য দেখতে পেত। মা আর বাবার একই ধরনের সংলাপ শুনতে শুনতে তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত ওদের ঝগড়া বেধে যেত; তারপর চিৎকার চেঁচামেচি। দিনের বেলাতেও তার জের চলতে থাকত। একই রেকর্ড বারবার বেজে যাওয়ার মতো দিনের পর রাত আসত, রাতের পর দিন।

হঠাৎ এক রাত্রে মা বলেছিল, 'আমি রাজী; তবে একবারই মোটে।' বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি তার বুঝি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বিছানার এককোণে দেয়ালের ধার ঘেঁষে শুয়ে থাকতে থাকতে সেদিন চমকে উঠেছিল পাবু। তার বুকের ভেতরটা ভীষণ কাঁপতে শুরু করেছিল। সেই বয়েসে পরিষ্কার ধারণা করতে না পারলেও তার মনে হচ্ছিল, এটা খুব খারাপ হল, খুব খারাপ। মা যদি বাবার কথায় রাজী না হয়ে সারা জীবন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত!

ওদিকে বাবা অবাক। যেন মা'র কথা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিল না। স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিস্ময় আর খুশিতে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'রীয়ালি শোভা, রীয়ালি তুমি রাজী!'

মা বলেছিল, 'বললামই তো!'

'ও ডার্লিং ; আমি যে তোমাকে নিয়ে আজ কী করব—' বলেই মাকে ওপরে তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে লাট্টুর মত পাক খেতে শুরু করেছিল বাবা।

মা ভয়ে ভয়ে চেঁচাচ্ছিল, 'ছাড়ো ছাড়ো—পড়ে যাব।'

অনেকক্ষণ পর মাকে নিচে নামিয়ে তার ঘাড়ে-গলায় গালে-ঠোঁটে চুমুর পর চুমু খেয়ে গিয়েছিল বাবা। বিব্রত বিপর্যস্ত মা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলেছিল, 'কী হচ্ছে? এ্যাই—এ্যাই—'

সেদিন মাকে কাছে বসিয়ে জোর করে একপাতে খেয়েছিল বাবা। মা বাবার এমন অন্তরঙ্গ দৃশ্য আগে কখনও ছাখে নি পাবু। জ্ঞান হবার পর থেকে সর্বক্ষণ পরস্পরের খিটিমিটি আর যুদ্ধই দেখেছে; এই ঘনিষ্ঠতায় তার খুশি হবার কথা। কিন্তু পাবুর ভাল লাগছিল না। গলার কাছটায় কি যেন ডেলা পাকিয়ে ভারী হয়ে যাচ্ছিল; ঢোঁক গিলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তার।

খেতে খেতে ওরা কথা বলছিল। ওরা বলতে বাবা একাই সমানে বকে যাচ্ছিল; মা মাঝে মধ্যে অস্পষ্ট হুঁ হাঁ করে সায় দিচ্ছিল শুধু।

বাবা বলছিল, 'তুমি আমাকে নিউ লাইফ দিলে শোভা—নতুন জীবন।'

তারপরই উচ্ছ্বাসের গলায় বাবা তার সেই পুরনো স্বপ্নটা আবার নতুন করে দেখতে শুরু করেছিল, 'তুটো মাস, মাত্র তুটো মাস, তার মধ্যে প্রোমোশন আমি একটা পাবই। তারপর উই শ্যাল হ্যাভ এ ডিসেণ্ট ফ্ল্যাট, কার, বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি—' একটু থেমে হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে পরমুহূর্তে বলেছিল, 'আচ্ছা শোভা—ফ্ল্যাটটা কোথায় নেওয়া যায় বল তো?'

'আমি কী বলব!'

বাবা একটু ভেবে আপন মনে বলেছিল, 'পেডার রোড কি ওর্লির দিকে যেতে পারলে ভাল হয়। অবশ্য এদিকে এই লিঙ্কিং রোড, পালি হিল-টিলও বেশ পশ হয়ে উঠছে। ফ্যাশনেবল সব বাড়ি উঠছে। এগুলোও মন্দ না, কি বল?'

মা উত্তর দেয় নি।

সেদিন রাত্রে বাবা আরো কতক্ষণ বকে গিয়েছিল, মনে পড়ে না পাবুর। ওদের কথা শুনতে শুনতে কখন একসময় যেন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরের দিন ঘুম ভাঙতেই পাবুর চোখে পড়েছিল বাবা একটা চেয়ারে বসে পা নাচিয়ে নাচিয়ে চা খাচ্ছে। একটু দূরে মা দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞান হবার পর থেকে এমন দৃশ্য আর কখনও ছাখে নি পাবু। অন্য দিন সকাল হলেই বাবা দারুণ ব্যস্ত; শেভ-টেভ করে স্নান-টান সেরে বেরুবার জন্য রেডি হতে থাকে। ছুটির দিনগুলোতেও সে বাড়ি থাকত না; সকালবেলাতেই তার বেরিয়ে পড়া চাই।

বাবা চা খেতে খেতে বলছিল, 'আজ আর অফিস যেতে ইচ্ছে করছে না।'

মা বলেছিল, 'যেতে ইচ্ছে না করলে যেও না; বাড়িতেই থাক।'

'বাড়িতে বসে থাকবার জন্য ছুটি নিচ্ছি নাকি। আজ আমরা বাইরে বাইরে ঘুরব; খাওয়া-দাওয়াও বাইরে। আজ হোল ডে বেড়াবার প্রোগ্রাম, বুঝলে! কতদিন যে তোমাদের নিয়ে বেড়াতে বেরুই না।' বলতে বলতে হঠাৎ বাবার চোখ পাবুর ওপর এসে পড়েছিল, 'আরে ঘুম ভেঙেছে! গেট আপ বয়, গেট আপ। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। আজ গোটা বম্বে চষে বেড়াব—' ঘোরাটা কি ধরনের হবে তা বোঝাবার জন্য হাওয়ায় আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড এক বৃত্ত এঁকে দেখিয়েছিল।

যে বাবা তার সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলে না, তার এরকম স্নেহময় ব্যবহার পাবুকে অবাক করে দিয়েছিল। যাই হোক পাবুর মনে আছে, আধঘণ্টার মধ্যে বাবা, মা আর সে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েছিল।

প্রথমে তারা গিয়েছিল প্রপার বম্বেতে, সেখান থেকে মোটর লঞ্চে এলিফ্যান্টা কেভ। তারপর কেভ থেকে ফিরে ব্যালার্ড এস্টেটে একটা দামী রেস্তোরাঁয় খেয়ে বিকেলে চলে এসেছিল চৌপাটিতে, সমুদ্রের পাড়ে বাদামী বালির ওপর বসে আরব সাগরে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে একসময় সন্ধ্যে নেমে এসেছিল। মালাবার হিল্স থেকে নরীম্যান পয়েন্ট পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভের অর্ধ বৃত্তাকার রাস্তাটায় অসংখ্য আলো জ্বলে উঠেছিল। কেন যে এই রাস্তাটাকে সন্ধ্যের পর কুইন্স নেকলেশ বলে, মুগ্ধ চোখে চারদিক দেখতে দেখতে বুঝতে পারছিল পাবু।

বাবা ফেরিওলাদের কাছে যা পাচ্ছিল তাই কিনছিল। ভেলপুরী, বাটাটা পুরী, চাকালি, সিং দানা। খেতে খেতে সমানে কথা বলে যাচ্ছিল সে—সেই প্রোমোশনের কথা, দামী ফ্ল্যাটের কথা, গাড়ির কথা—

সেই দিনটা আর সব দিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ঝলমলে, রঙীন, ফুরফুরে। তবু থেকে থেকে বুকের ভেতরটা ভীষণ ভারী হয়ে যাচ্ছিল পাবুর।

অনেক রাত পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভে কাটিয়ে ওরা গিয়েছিল একটা চাইনীজ হোটেলে। সেখানে খেয়ে সোজা চার্চগেট স্টেশন; তারপর লাস্ট সাবার্বন ট্রেন ধরে ঘরে ফিরে এসেছিল। মা বাবার প্রোপোজালে রাজী; সেই জন্যেই বোধহয় এইরকম একটা দিন বাবা তাকে ঘুষ দিয়েছিল।

পরের দিন সকালে আবার বাবাকে আগের মত ব্যস্ত দেখা গিয়েছিল। সেই দাড়ি কামানো, স্নান করা, ব্রেকফাস্ট খাওয়া। তারপর অফিসে বেরুবার মুখে মাকে বলেছিল, 'আমি আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।'

মা বলেছিল, 'আচ্ছা।'

'তোমার সেই মাইশোর সিল্কের শাড়িটা বাড়িতেই আছে, না লণ্ড্রীতে?'

'বাড়িতে। কেন?'

'ওটা আজ পরবে। তুমি তৈরি থেকো; তিনটে থেকে চারটের মধ্যে আমি ফিরে আসব।'

মা উত্তর দ্যায় নি। বাবাও আর কিছু না বলে অফিসে চলে গিয়েছিল। তার খানিকটা পর স্কুলবাস এসে পাবুকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

স্কুল থেকে ফিরে পাবু দেখেছিল, মা চড়া রঙের মাইশোর সিল্কের শাড়ি আর স্লিভলেশ ব্লাউজ পরে বসে আছে; চুল শ্যাম্পু করা, ঠোঁটে এবং নখে উগ্র রঙ। মাকে ফিল্মস্টারদের চাইতেও দেখতে সুন্দর লাগছিল। অবাক তাকিয়ে থাকতে থাকতে পাবু লক্ষ করেছিল, মা যেন ভেতরে ভেতরে ভয়ঙ্কর অস্থির আর ভীত হয়ে পড়েছে। মা'র এত অস্থিরতা এবং ভয় আগে কখনও দেখা যায় নি।

সেদিন চারটে বাজতে না বাজতেই বাবা ফিরে এসেছিল। তবে মদে চুর হয়ে নয়; সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো। মা'র দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'আরে বাবা, তুমি রাস্তায় বেরুলে হোল বম্বে বিলকুল ম্যাড হয়ে যাবে। আমারই শালা মাথা রাঁল করছে।'

মা চুপ।

বাবা আবার বলেছিল, 'তুমি যে এমন টেরিফিক বিউটিফুল, আগে তো দেখি নি। আমি রীয়ালি একটা লাকি ডগ।'

বাবার উচ্ছ্বাসে মা সাড়া দ্যায় নি। আবছা গলায় শুধু বলেছিল, 'আমার মাংস যেখানে বিক্রি করতে নিয়ে যাবে, এখন সেখানে চল।'

বাবা থতিয়ে গিয়েছিল, 'আহা, ওরকম করে বলছ কেন? ফর আওয়ার ব্রাইট বেটার ফিউচার—'

মা বলেছিল, 'প্লীজ চুপ কর।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, চল, বেরিয়ে পড়ি।'

কিন্তু মুশকিল হয়েছিল পাবুকে নিয়ে। দুজনে বেরিয়ে গেলে বাচ্চা ছেলেটা একা একা ফ্ল্যাটে কি করে থাকবে, সমস্যাটা ছিল তাই। বাবা চোখ কুঁচকে পাবুর দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'দিস সোয়াইন ইজ এ প্রবলেম নাউ।' একটু ভেবে বলেছিল, 'ও-কে, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে; উল্লুকটাও আমাদের সঙ্গে চলুক—'

মা চমকে উঠেছিল, 'ওর সামনেই আমাকে বেচবে নাকি!'

'কী যা তা বলছ! দেখ, আমি সব ম্যানেজ করে নেব।'

ফ্ল্যাটে তালা ঝুলিয়ে একসময় ওরা বেরিয়ে পড়েছিল। বাসে বা ট্রেনে না; একেবারে ট্যাক্সিতে। যদিও পিছনের সীটে তিনজন একসঙ্গে বসা যায় তবু আগে থেকেই পাবু সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসেছিল; মা আর বাবা পিছনে। পাবুর চোখ বাঁদিকের জানলার বাইরে ফেরানো, কিন্তু কান ছিল পিছন দিকে।

বাবা ট্যাক্সিওয়ালাকে সোজা প্রপার বম্বেতে চলে যেতে বলেছিল। কথামতো ট্যাক্সিটা আম্বেদকর রোড থেকে নেমে খোড়বন্দর রোড ধরেছিল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর মাহিম ক্রীকের জেলেপাড়া ছাড়িয়ে ট্যাক্সি যখন দাদারের দিকে মোড় ঘুরছে সেই সময় বাবা হঠাৎ চাপা গলায় মাকে বলেছিল, 'তোমাকে দেখলে সায়গল বাস্টার্ডটা হয়তো গোটা কোম্পানিই আমার নামে লিখে দেবে।'

মা চাপা গলায় বলেছিল, 'সায়গলের কাছ থেকে ফেরার সময় একটা কাজ করবে?'

'কী?'

'আমাকে বিষ কিনে দেবে?'

এই সময় ঘাড় ফিরিয়ে চট করে মাকে একবার দেখে নিয়েছিল পাবু। সেই মুহূর্তে মা'র মধ্যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব চলছে। ভয় অস্থিরতা উৎকণ্ঠা—সব মিলিয়ে তার মুখের ওপর দিয়ে কতরকমের অভিব্যক্তি যে খেলে যাচ্ছিল।

বাবা মা'র কাঁধে হাত রেখে বুঝিয়ে যাচ্ছিল, 'ডোণ্ট বী সেণ্টিমেণ্টাল শোভা। তোমাকে তো আগেই বলেছি, দিস ইজ নাথিং। মনটা পিওর থাকলেই হল। আমার কাছে তুমি যা আছ, তাই থাকবে। মাঝখান থেকে কতখানি লাভ বল তো—হে-হে—এ্যাই ডার্লিং, টেক ইট ঈজি—এ্যাই—'

মা এবার আর উত্তর দেয় নি। মুখ ফিরিয়ে শূন্য চোখে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল।

ঘণ্টাখানেকও লাগে নি, ওরা বম্বে শহরে পৌঁছে গিয়েছিল। পাবুর যতদূর মনে আছে, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা থেমেছিল। সেদিন বুঝতে পারে নি, পরে বড় হয়ে সে জেনেছে ওটা একটা ক্লাব। বাইরে অসংখ্য ইম্পোর্টেড কার আর বয়-বেয়ারাদের ব্যস্ত ছোটাছুটি চোখে পড়ছিল।

বাবা মাকে নিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছিল। পাবুকে দেখিয়ে ট্যাক্সি-

ওয়ালাকে বলেছিল, 'এই ছোকরা রইল। মিনিট দশেক ওয়েট করুন; আমরা ভেতর থেকে ঘুরে আসছি।'

ট্যাক্সিওয়ালা মাথা হেলিয়ে বলেছিল, 'ঠিক হায় সাব।'

বাবা আর দাঁড়ায় নি; মাকে সঙ্গে নিয়ে সেই বাড়িটার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

একদিকে তাজমহল হোটেলের সুন্দর বাড়ি, আরেক দিকে সমুদ্র, গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়া, ব্যালার্ড পিয়েব—জায়গাটা চমৎকার। কিন্তু কিছুই ভাল লাগছিল না পাবুর। মাকে নিয়ে বাবা কোথায় গেল? ওরা কখন ফিরবে? মাকে ওরা মেরে-টেরে ফেলবে না তো? ভয়ে আর উদ্বেগে পাবুর নিশ্বাস আটকে আসছিল।

বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় নি। মিনিট পনেরর মধ্যেই বাবা ফিরে এসেছিল। এসেছিল একটা দামী ইম্পোর্টেড গাড়িতে করে। সেই গাড়িতে মা-ও ছিল। আর ছিল সুদর্শন এবং স্মার্ট চেহারার মধ্যবয়সী একটি লোক—খুব সম্ভব সে-ই সায়গল। সামনেব সীটে ঝকঝকে ইউনিফর্মপরা সোফার। তাদের সেই গাড়িটা ট্যাক্সির কাছে এসে থেমে গিয়েছিল। বাবা দ্রুত নেমে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সায়গলকে বলেছিল, 'তা হলে স্যার, ঘণ্টাদুই পর আমি ওই হোটেলে যাচ্ছি—'

কী একটা হোটেলের নাম যেন বলেছিল বাবা, পাবুর মনে নেই। ট্যাক্সিতে বসে সে ব্যাকুলভাবে মাকে দেখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু সায়গলের ওপাশে বসে থাকার জন্য মা'র মুখটা দেখা যাচ্ছিল না; শুধু তার মাইশোর সিল্কের খানিকটা অংশ, একটা হাত এবং হাঁটুর কাছটা চোখে পড়ছিল।

সায়গল বাবাকে বলেছিল, 'অল রাইট, তু ঘণ্টা পরেই আসুন—'

তারপব সায়গলের গাড়িটা আর দাঁড়ায় নি; মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

গাড়িটা যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়েই ছিল পাবু। তার বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে কান্না উঠে আসছিল, কিন্তু কিছুতেই কাঁদতে পারছিল না সে।

এদিকে বাবা ট্যাক্সিভাড়া চুকিয়ে পাবুকে নামিয়ে নিয়েছিল। তারপর ঘণ্টা তুই বাবার গায়ে জুড়ে থেকে বম্বে শহরের রাস্তায় রাস্তায় নিঃশব্দে ঘুরে বেড়িয়েছিল পাবু। ঘুরতে ঘুরতে একসময় ওরা মেরিন ড্রাইভের একটা বড় হোটেলের কাছে চলে এসেছিল।

বাবা তাকে বলেছিল, 'তুই এখানে দাঁড়া; কোথাও যাবি না; আমি তোর

মাকে নিয়ে আসছি।' ফুটপাথে পাবুকে দাঁড় করিয়ে হোটেলের ভেতর ঢুকে গি.য়ছিল বাবা। কিছুক্ষণ পর সত্যি সত্যিই মাকে নিয়ে ফিরে এসেছিল সে। সেই লোকটা—সায়গল তাদের সঙ্গে ছিল না।

মা'র দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিল পাবু। দু' ঘণ্টার মধ্যে তার শরীরটা যেন ভেঙেচুরে কিরকম হয়ে গেছে। ঘোলাটে চোখ এক ইঞ্চি ভেতরে ঢোকানো। গাল আর কণ্ঠার হাড় গজালের মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। চুল এলোমেলো. ঠোঁটের রঙ জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছিল তাকে। মা যেন বেঁচে নেই, বাবা একটা মরা মানুষের শবকে বুঝি টেনে টেনে নিয়ে এসেছিল।

এই কি তাব লাবণ্যময়ী মা? যে কান্নাটা এতক্ষণ গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে ছিল, এবার সেটা বেরিয়ে আসার রাস্তা পেয়েছিল যেন। হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল পাবু। বাবা চমকে তার দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠেছিল, 'ইউ সোয়াইন, স্টপ ইট—স্টপ ইট—'

ভয় পেয়ে চুপ করে গিয়েছিল পাবু।

ছেলেকে ঠাণ্ডা করে একটা ট্যাক্সি ডেকে বাবা ওদের তুলে নিয়েছিল। এবার বাড়ি ফেরার পালা। তখনকার মতো সামনের সীটে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল পাবু; মা আর বাবা পেছনে।

পাবু উইণ্ডস্ক্রীনের বাইরে তাকিয়ে ছিল; ঘাড় ফিরিয়ে মাকে দেখতে ইচ্ছা করছিল না তার। কি আর দেখবে। হোটেলের সামনে ধমকে তার যে কান্নাটা বাবা থামিয়ে দিয়েছিল সেটা ভেতরে ভেতরে চলছিলই। নিজের অজান্তেই চোখ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় জল বেরিয়ে আসছিল পাবুর।

ঘাড় না ফেরালেও পেছন থেকে টুকরো টুকরো কথা তার কানে আসছিল। বাবা একলাই চাপা গলায় অনবরত বলে যাচ্ছিল, 'শোভা এত ভেঙে পড়ো না। আমি বলছি—আই অ্যাম ইওর হাজব্যাণ্ড—এটা কিছুই না। মর্যালিটি-টর্যালিটির ডেফিনিশন এখন বদলে গেছে। টেক ইট ইজি মাই ডার্লিং—'

বাড়ি ফিরে বমি করে ফেলেছিল মা; তারপর মাঝরাত থেকে জ্বর।

দিন কয়েক ভুগবার পর মা খানিকটা সুস্থ হলে বাবা বলেছিল, 'সায়গল সাহেব তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল। তোমাকে ভীষণ দেখতে চাইছে, আজ যেতে পারবে? জাস্ট ফর অ্যান আওয়ার—'

করুণ মুখে মা বলেছিল, 'সেদিনই তো গেলাম; আবার যেতে হবে?'

,অনেকদূর আমি এগিয়ে গেছি। সায়গল শালাকে, বুঝতেই পারছ, এখন একটু লুব্রিকেট করতে পারলে—হেঁ—হেঁ—বুঝতেই পারছ—'

একরকম জোর করেই মাকে আবার রাজী করিয়েছিল বাবা। সঙ্গে সঙ্গে পাবুকে নিয়ে আবার সেই সমস্যা দেখা দিয়েছিল ; শেষ পর্যন্ত ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে তাকে নিয়েই বাবা-মা বেরিয়ে পড়েছিল।

গেটওয়ে অফ ইণ্ডিয়ার কাছে আবার সেই ক্লাব ; ট্যাক্সিতে পাবুকে বসিয়ে রেখে মা-বাবার ভেতরে চলে যাওয়া ; একটু পর সায়গলের গাড়িতে ফিরে আসা ; মাকে সায়গলের পাশে বসিয়ে বাবার নেমে পড়া ; ঘণ্টাখানেক পর মেরিন ড্রাইভের হোটেল থেকে মাকে বার করে আনা—আগের বার যা যা ঘটেছিল এবারও অবিকল তারই কার্বন কপি। শুধু একটা জায়গায় খানিকটা অমিল ছিল। মা এবার আর অতটা আপসেট হয়ে পড়ে নি ; তার প্রতিক্রিয়া আগের বারের মতো তীব্র ছিল না।

যাই হোক, এর পরও বাবার সঙ্গে আরো কয়েকবার মাকে সায়গলের কাছে যেতে হয়েছিল। ফলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বাবা যে সুচতুর ছক কেটে রেখেছিল সেটা হুবহু মিলে যেতে শুরু করেছিল। তিন মাসের মধ্যে তিনটে প্রোমোশন পেয়েছিল ; মাইনে চারগুণ বেড়েছিল। কোম্পানি থেকে একটা গাড়ি দিয়েছিল। গাড়িটা যদিও ফিয়েট এবং ছোট, তবু গাড়ি তো। তা ছাড়া হাউস রেণ্ট, ফোনও পাচ্ছিল বাবা।

আম্বেদকর রোডের সেই স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার বুকচাপা বাড়ি ছেড়ে লিঙ্কিং রোডের চার হাজার ফুট ফ্লোর এরীয়ার প্রকাণ্ড নতুন ফ্ল্যাটে উঠে গিয়েছিল তারা। দু ঘরে দুটো এয়ারকুলার বসানো হয়েছিল। বয়-বেয়ারা-বাবুর্চি মিলিয়ে চার পাঁচজন কাজের লোক রাখা হয়েছিল। আগে আগে বাস-বাসে করে স্কুলে যেত পাবু। তখন থেকে নতুন গাড়ি তাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে আসত। তার মানে এই নয় যে পাবুর প্রতি বাবার স্নেহ মমতা উথলে উঠেছিল। আসলে তাদের যে একটা নতুন গাড়ি হয়েছে, সেটা দেখানোই ছিল বাবার উদ্দেশ্য।

বাবা বলত, 'ভেবে দেখ শোভা, আম্বেদকর রোডের সেই বাড়ি আর এই ফ্ল্যাটের মধ্যে কত তফাত। লাইফ ইজ সো নাইস হীয়ার। আঃ, এখানে যেন বেঁচে গেছি।'

মা কিছু বলত না, স্থির চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত।

বাবা বলত, 'সবই তোমার জন্য শোভা ; আমি তোমার কাছে গ্রেটফুল।'

মা বলত, 'সত্যি!'

বাবা বলত, 'সত্যি সত্যি সত্যি। তবে লিঙ্কিং রোডের এই ফ্ল্যাটে আমি খুশি না। আমি অনেক বেশি অ্যাম্বিশাস; আমার উচ্চাশার শেষ নেই। আমি জানি তুমি যদি আমার পাশে থাক, আই ক্যান মুভ আপটু স্কাই—'

একটা ব্যাপার পাবু লক্ষ্য করেছে, লিঙ্কিং রোডে উঠে আসবার পর বাবার জীবনের অ্যাটিচুডটাই পুরোপুরি বদলে গিয়েছিল। তখন বাবা ক্লাবে যেত, আপার সোসাইটির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করত, তা ছাড়া রোজ একটা না একটা পার্টি তো ছিলই। আগে আগে আম্বেদকর রোডের বাড়িতে থাকতে ধেনী কী ঠাররা খেয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফিরে হৈ-হল্লা করত বাবা। লিঙ্কিং রোডে আসবার পর দেশী ড্রিংক ছুঁত না, দামী দামী বিদেশী মদ খেত। তবে আগের মতো আর চেঁচামেচি করত না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, মা-ও দ্রুত বদলে যাচ্ছিল। মা-ও বাবার সঙ্গে প্রায়ই ক্লাব বা পার্টিতে যেত। পাবু টের পেত, মা কোন কোন দিন ড্রিঙ্ক করে ফিরত। প্রথম প্রথম ড্রিঙ্ক করে এলে মা পাবুর সামনে আসত না। সোজা নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিত। পরে লজ্জা বা সঙ্কোচ কোনটাই আর ছিল না। শুধু তাই না, মাকে ঘিরে একটা মৌচাক গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সন্ধ্যের পর নানা ধরনের লোক—কোন কোম্পানির টপ এক্‌জিকিউটিভ, গভর্নমেণ্ট অফিসার, বিজনেসম্যান, আর্মি অফিসার বাড়িতেই আড্ডা দিতে আসত। তবে সব চাইতে যে বেশি আসত সে ব্রিজেশ সিং। একটা ফরেন এয়ার-লাইন্সের পাইলট, এই লোকটার রোজ একবার না এলে পেটের খাবার হজম হত না। সেই তখন থেকেই লোকটা রাহুর মতো মা'র সঙ্গে লেগে আছে। মা'র চারপাশে ঘন হয়ে বসে তারা সমানে মাঝরাত পর্যন্ত ফ্ল্যাটারি করে যেত। বেশির ভাগ দিনই বাবা সেই সময়টা বাড়িতে থাকত না। বাবা তখন ক্লাবে।

পাবুর তখন দামী দামী পোশাক, তাকে দেখাশোনা করবার জন্য একজন গভর্নেস, পড়বার জন্য দু'জন প্রাইভেট টিউটর, স্কুলে যাওয়ার জন্য ঝকঝকে গাড়ি, তার জন্য ভাল ভাল খাবার, প্রচুর আরাম—তবু কিছুই ভাল লাগত না। বাবাকে কোনদিনই সে কাছে পায় নি। আম্বেদকর রোডে থাকতে যে মা প্রায় সারাদিন বিষণ্ণ করুণ মুখে বসে থাকত আর বাবার সঙ্গে দেখা হলেই যুদ্ধ চালিয়ে যেত সে ছিল অনেক কাছাকাছি। তাকে যেন খানিকটা বুঝতে পারত পাবু। কিন্তু লিঙ্কিং রোডে আসার পর সেই মা বহু দূরে সরে গিয়েছিল।

বাবার সঙ্গে কোনদিনই তার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। মা-ও যখন দূরে চলে গেল, একা একা সময় তার কাটতে চাইত না। সেই বয়সেই আরব সাগরের কোন দ্বীপের মতো সে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল।

মনে পড়ে লিন্ডিং রোডে আসার বছরখানেক পর একদিন রাত্তিরে ক্লাব থেকে ফিরে বাবা মাকে বলেছিল, 'ফাইন আছ শোভা—'

মা জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফাইন বলতে?'

'নিজেকে ঘিরে বী-হাইভ তৈরি করে নিয়েছ। বাস্টার্ডগুলো সবসময় তোমাকে ফ্ল্যাটারি করে যাচ্ছে।'

'তোমার হিংসে হচ্ছে?'

'দেখ শোভা, তুমি আমার জন্যে অনেক কিছু করেছ; আই অ্যাম রীয়ালি গ্রেটফুল টু ইউ। কিন্তু ওই লোকগুলো রোজ সন্ধ্যে থেকে মাঝরাত পর্যন্ত আমার ফ্ল্যাটে বসে থাকবে, এ আমি পছন্দ করি না।'

মা ঘাড় হেলিয়ে স্থির পলকহীন চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তারপর আস্তে করে বলেছিল, 'দে আর নাইস পীপল্; ওদের সঙ্গ আমি পছন্দ করি।'

বাবা চেঁচিয়ে বলেছিল, 'তোমার পছন্দ-অপছন্দে কিছু যায় আসে না। দিস মাস্ট বী স্টপ্ড্।'

'সার্টেনলি নট। ওরা আসবে।'

আসলে মা'র মধ্যে আম্বেদকর রোডের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সেই শোভা নাদকার্ণি আর ছিল না। সে একেবারে বদলে গিয়েছিল। ড্রিঙ্ক-ফ্ল্যাটারি ইত্যাদিতে ঘেরা এক আশ্চর্য অভ্যাস তার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল: সেখান থেকে তার আর ফেরার উপায় ছিল না।

কিন্তু বাবার কথা আলাদা। পরে বড় হয়ে পাবু ভেবে দেখেছে, বাবা যতই আপস্টার্ট হোক, কাঁধে ডানা লাগিয়ে উড়তে চেষ্টা করুক, তার মধ্যে কোথায় যেন মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের একটুখানি তলানি থেকে গিয়েছিল। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্ত্রীকে ঘুষ দেবার পরও তার ইচ্ছা, স্ত্রী একান্তভাবে তারই অনুগত থাক। দশটা লোক তাকে ঘিরে অনবরত মাছির মতো ভনভন করবে, এতে তার একেবারেই সায় নেই। কিংবা পুরুষের সেই 'সেন্স অফ পজেসান' বা অধিকার-বোধই তাকে হয়তো ঈর্ষান্বিত করে থাকবে।

যাই হোক, বাবা প্রথমটা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল, প্রতিধ্বনির মতো করে বলেছিল, 'ওরা আসবে!'

মা বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

বাবা এবার চিৎকার করে উঠেছিল, 'কিছুতেই না। দিস ইজ মাই ফ্ল্যাট—মনে রেখ। আমার ফ্ল্যাটে এসব চলবে না।'

'এটা তোমার ফ্ল্যাট?' মা সোজা বাবার চোখের ভেতর তাকিয়েছিল, 'তোমার এই ফ্ল্যাটটা হল কোত্থেকে?'

বাবা অস্বস্তি বোধ করেছিল, 'আমি জানি এটা তোমার গিফ্‌ট্। তবু এখানে ওসব চলবে না। দিস ইজ মাই লাস্ট ওয়ার্ড।'

'তাই নাকি!'

বাবার লাস্ট ওয়ার্ডকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে মা তার ড্রিঙ্ক আর অ্যাডমায়ারারদের নিয়েই দিন কাটিয়ে দিচ্ছিল। ফলে বাবা প্রথম প্রথম কিছুদিন চেঁচামেচি করেছে। মা-ও ছেড়ে দ্যায় নি। মদ খেয়ে দুজনের মারামারিও হয়েছে অনেকদিন। হাতের কাছে যে যা পেত তাই ছুঁড়ে মারত। ফলে বুঝি সময় রোজই এক আধ ডজন কাচের গেলাস আর প্লেট ভাঙত।

কিছুদিন এ রকম যুদ্ধ চলার পর বাবা হঠাৎ থেমে গিয়েছিল। বুঝি বুঝতে পেরেছিল মা তার হাতের বাইরে চলে গেছে।

পাবু লক্ষ্য করেছিল, মা আর বাবার মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে। প্রথম দিকে বাবার সঙ্গেই ক্লাবে যেত মা কিংবা বাড়িতে বসে স্তাবকদের নিয়ে আড্ডা জমাত। পরে একা একাই হোটেল কিংবা ক্লাবে চলে যেত। কোন দিন রাত কাবার করে মদে চুর হয়ে ভোরের দিকে ফিরে আসত, কখনও দু-চারদিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে আসত। বাবা জিজ্ঞেস করলে বলত, 'প্লীজ ডোণ্ট আস্ক; আমি নাবালিকা নই।' বলেই নেশার ঘোরে জোরে জোরে হেঁচকি তুলত।

বাবা বলত, 'দিস ইজ অফুলি ব্যাড শোভা—'

'তাই নাকি!'

'ইয়েস; এভাবে চলতে পারে না।'

'চালাতে কে বলেছে?'

বাবা আর কিছু বলত না। তবে বাবা যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ আর অসন্তুষ্ট পাবু তা টের পেত।

এভাবে কিছুদিন চলবার পর এক ছুটির দিনের সকালে মা আর বাবা ডাইনিং রুমে ব্রেকফাস্ট করছিল। বাইরের লবীতে একটা গোল বেতের চেয়ারে বসে পাবু ছবির বই দেখছিল। সেখান থেকে মা আর বাবাকে দেখা যায়; তাদের কথাও শোনা যায়।

বাবা বলছিল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল শোভা—'

মা মুখ তুলে তাকিয়েছিল, 'কী ?'

'ভাবছি চাকরি-টাকরি আর করব না।'

একটু চুপ করে থেকে মা বলেছিল, 'কী করবে তা হলে ?'

বাবা বলেছিল, 'বিজনেস। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার হেল্প দরকার।'

'কি ভাবে হেল্প করতে হবে ?'

'মানে বুঝতেই পারছ, আমার তো আর ক্যাপিটাল নেই। একজন বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কিছু টাকা দেবে বলেছে, কিন্তু বড্ড ঘোরাচ্ছে। তোমার সঙ্গে লোকটার আলাপ করিয়ে দেব। আই অ্যাম সিওর, তোমাকে দেখলে ওই ব্লাডি বাস্টার্ডটা নির্ঘাত কব্জা হয়ে যাবে।'

ফর্ক দিয়ে ওমলেটের গায়ে দাগ কাটতে কাটতে মা বলেছিল, 'তার মানে তোমার সেই ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টের সঙ্গে ক্লাবে যেতে হবে, বার-এ যেতে হবে, হোটেলের স্যুটে রাত কাটাতে হবে—এই তো ?'

'মানে আমাদের ব্রাইট বেটার ফিউচারের জন্য—'

মা ভুম করে বলেছিল, 'আমি পারব না।'

বাবা বলেছিল, 'কেন ? অসুবিধাটা কী ? তুমি তো আর আগের মত লজ্জাবতী কুলবধূটি নেই।'

মা চিৎকার করে উঠেছিল, 'নিজের ক্ষমতা নেই, বউকে ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে ওপরে উঠতে চাও ! তোমার মতো স্কাউণ্ড্রেলের জন্যে আমি আর কিচ্ছু করব না।'

বাবাও সমানে চেঁচিয়েছিল, 'একটা থার্ড ক্লাস প্রস্টিটিউট, তার আবার লম্বা লম্বা কথা ! যা বললাম, করতে হবে তোকে—'

এই নিয়ে আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন রোজ চিৎকার, ঝগড়া, মারামারি। শেষ পর্যন্ত মা পাবুকে নিয়ে সাণ্টাক্রুজে একটা গেস্ট হাউসে উঠে গিয়েছিল, সেখানে থেকে আরো দু-এক জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। এর মধ্যে বাবার সঙ্গে মা'র লিগ্যাল সেপারেসন হয়ে গেছে।

বাবা এখন থাকে মহালছমী রেসকোর্সের কাছে একটা ফ্ল্যাটে। একজন পার্শী বিধবা মহিলাকে বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে কচিৎ-কখনো তার সঙ্গে পাবুর দেখা হয়। কিন্তু বাবার কথা পরে।

মা বাবাকে ছেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার অ্যাডমায়াররা তাকে ছাড়ে নি ; যেখানেই মা গেছে হায়েনার ঝাঁকের মতো তারাও সঙ্গে সঙ্গে আছে। বিশেষ করে ওই ব্রিজেশ সিং নামে লোকটা। দিনে দিনে মা'র স্তাবকের সংখ্যা বেড়েছে ;

বেড়েই চলেছে। মা'র সেই পুরনো অভ্যাসগুলি—ড্রিঙ্ক করা, ক্লাবে যাওয়া, বাইরে বাইরে রাত কাটানো—এতদিনে তাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলেছে। সে এখন পুরোপুরি ওই সবের স্লেভ।

মনে পড়ছে, বাবার সঙ্গে ডাইভোর্স হবার পর মা আবার তার কুমারী জীবনের নামটা নিয়েছিল। অর্থাৎ শোভা নাদকার্ণি থেকে শোভা শাঠে। বিবাহিত জীবনকেই যখন সে অগ্রাহ্য করেছে তখন আর বাবার পদবী নাদকার্ণিটা নামের সঙ্গে জুড়ে রেখে লাভ কী?

যাই হোক, মা চাকরি-বাকরি কিছুই করে না, তবু ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের এই বিশাল ফ্ল্যাটে দামী ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের মতো অজস্র আরাম আর বিলাসে কি করে জীবন কাটায় তা বুঝবার বয়স পাবুর হয়েছে। সে জানে তার মা বম্বের সোসাইটি গার্ল। খারাপ কথায়—না, নিজের মা'র সম্বন্ধে সে কথাটা ভাবতেও পাবুর ইচ্ছা বা রুচি কোনোদিনই হয় না।

এ তো মা-বাবার কথা। আর পাবু নিজে? সেই ছেলেবেলা থেকে একা একা কাটিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে সে। কিছুই তার ভাল লাগে না। লিঙ্কিং রোড থেকে চলে আসার পর মা অবশ্য তার পড়াশোনো এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল। স্কুল লীভিং পরীক্ষায় পাস করে বছর তিনেক উইলসন কলেজেও পড়েছে সে, কিন্তু ভাল না লাগাতে পড়াই ছেড়ে দিয়েছে। এখন দিনের বেশির ভাগ সময়ই চুপচাপ ঘরে বসে থাকে পাবু। কখনও কখনও সী সাইড রোডে কিংবা মাউণ্ট মেরী চার্চে গিয়ে জেকব বুড়োর সঙ্গে গল্প করে। খুব বেশি নিঃসঙ্গ লাগলে কোন কোন দিন রাত্রিবেলা ওদের রাস্তার উল্টো দিকে ওই রেস্তোরাঁটায় গিয়ে খানিকটা ফেনী-টেনী খায়।

এ সবের মধ্যেও পাবুর সামান্য একটা শখ আছে। সেটা হল অভিনয়। কলেজে পড়তে পড়তে একটা পাবলিসিটি ফার্মের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল। ওরা বিভিন্ন কোম্পানির ছোট ছোট অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট ফিল্ম তোলে। মাঝে মাঝে এই অ্যাডভার্টাইজমেণ্ট ফিল্মে অভিনয় করে পাবু। যদিও এ ব্যাপারে তার প্রায়ই ডাক আসে, পাবু কিন্তু [illegible] কখনো নয়। ইচ্ছা করলে অ্যাডফিল্মের অভিনয় থেকে সে কেরীয়ার গড়ে নিতে পারত। পাবলিসিটি ফিল্মে অভিনয় করতে করতেই সে যদি চেষ্টা করলে বড় বড় প্রডিউসারদের চোখে পড়ত না? কিন্তু সেসব ব্যাপারে তার উদ্যম নেই, প্রচেষ্টা নেই।

একা একা থাকতে থাকতে কোন দিন পাবুর মনে হয়, মা'র সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, এখান থেকে সে চলে যাবে কিন্তু যেতে গিয়েও পারে না। মাকে

ঘৃণা করে সে ; নিদারুণ ঘৃণা। আর এই ঘৃণাই কিছুতেই মা'র কাছ থেকে তাকে সরে যেতে দ্যায় না।

কতক্ষণ পশ্চিমের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল, পাবুর মনে নেই। হঠাৎ সমুদ্রের দিক থেকে অনেকগুলো সাগরপাখি ডেকে উঠল। চমকে পাবু লক্ষ্য করল, মধ্যরাতের এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড যেন ইতিহাসের পরিত্যক্ত নগরী। কোন বাড়িতেই এখন আর আলো জ্বলছে না; এমন কি রাস্তার আলোগুলোও নিভে গেছে? এতক্ষণে পাবুর মনে হল, ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে। ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে সে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন ঘুম যখন ভাঙল, বেশ বেলা হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়েই সে দেখতে পেল আরব সাগরে অজস্র রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। ডাঙার দিক থেকে ঝাঁক ঝাঁক জেলে নৌকো বেরিয়ে দূরে, অনেক অনেক দূরে, আকাশ আর সমুদ্র যেখানে একাকার, সেখানে চলে যাচ্ছে। সী সাইড রোড থেকে বাস-ট্যাক্সি প্রাইভেট কারের আওয়াজ ভেসে আসছে।

'কট'-এর তলায় হরিশটা নেই। সে এখন কোথায়, শুয়ে শুয়েই টের পাচ্ছিল পাবু। কেননা কিচেনে ট্রানজিস্টার চালিয়ে তার সঙ্গে স্বর মিলিয়ে হিন্দী গান গাইতে গাইতে কি যেন করছে ছোকরা।

ঘুম ভাঙবার পরও অনেকক্ষণ অলসভাবে শুয়েই থাকল পাবু। তারপর একসময় উঠে গিয়ে সামনের করিডোরে সেই বেসিনটায় মুখ ধুতে লাগল। ধুতে ধুতে ডানধারের ঘরটায় তাকিয়ে দেখল, মা এখনও ঘুমোচ্ছে।

চুল এলোমেলো, একটা পা খাটের বাইরে ঝুলছে, ডান হাতটা চিত হয়ে আছে। বালিশে মুখের অর্ধেকটা গোঁজা, ফলে পুরো মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। যে দিকটা দেখা যাচ্ছিল সেদিকে গালের কষ থেকে লালা গড়িয়ে বালিশের অনেকখানি ভিজিয়ে ফেলেছে। মা যে অবস্থায় কাল ফিরেছে, তাতে কখন উঠবে কে জানে। দুপুরের আগে তো নিশ্চয়ই না।

এক পলক তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল পাবু। তারপর দ্রুত কুলকুচি করে তোয়ালেতে মুখ মুছে পশ্চিমের সেই ব্যালকনিতে গেল। আর গিয়েই চমকে উঠল। ওধারের সেই ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে কালকের সেই মেয়েটা দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। আজ সে একাই আছে; সেই মধ্যবয়সী ষাঁড়ের মত কাঁধওলা লোকটাকে তার পাশে দেখা গেল না।

কী যেন নাম? একটু ভাবতেই মনে পড়ে গেল—জুলি। কাল রাত্রে মেয়েটাকে সুন্দর মনে হয়েছিল। এখন এই দিনের বেলা তাকে আরো ভাল লাগল।

কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র আকর্ষণ বা কৌতূহল নেই পাবুর। তবু কালকের মতো আজও নিজের অজান্তে তাকিয়ে থাকল সে। মেয়েটা খুব নিবিষ্ট হয়ে সমুদ্র দেখছিল, তাই পাবুকে দেখতে পায় নি।

কিছুক্ষণ পর একরকম জোর করেই মুখটা সমুদ্রের দিকে ফিরিয়ে নিল পাবু। মনে মনে যেন বলল, ওভাবে কারো, বিশেষ করে কোন মেয়ের দিকে চেয়ে থাকা খুব খারাপ।

সমুদ্রের দিকেও কিন্তু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না পাবু; বারবার তার চোখ মেয়েটার দিকে ফিরে যাচ্ছিল।

হঠাৎ জুলি এদিকে ঘুরতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। পাবু তাড়াতাড়ি সমুদ্র দেখতে লাগল। একটু পর আবার যখন পাবু জুলির দিকে তাকাল, দেখল মেয়েটা একদৃষ্টে তাকে লক্ষ্য করছে। পাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

আচমকা মেয়েটি বলল, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

পাবু হকচকিয়ে গেল, তারপর কিছুটা সামলে নিয়ে বলল, 'কি জানি, হয়তো রাস্তায়-টাস্তায়—'

'উঁহু—উঁহু; রাস্তায়-ফাস্তায় না। দাঁড়ান, একটু ভাবি, মনে পড়ে যাবে—'

পাবু হাসল, 'বেশ, ভাবুন—'

ঠোঁট কামড়ে, কপাল কুঁচকে খানিকক্ষণ ভেবে নিল জুলি। তারপর বলল, 'না, মনে করতে পারছি না। মেমারি ভীষণ বিট্রে করছে। যাক গে, একসময় না একসময় ভেবে বার করব।'

এবার আর কিছু বলল না পাবু; হাসল শুধু।

একটু চুপ করে থেকে জুলি বলল, 'এ বাড়িতে আপনারা কতদিন আছেন?'

পাবু বলল, 'চার বছরের মতো।'

জুলি বলল, 'আমি একেবারে নতুন; কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছি।'

পাবু বলতে যাচ্ছিল এ খবরটা সে জানে। কি ভেবে আর বলল না।

জুলি আবার বলল, 'ফ্ল্যাটটা চার পাঁচ মাস আগেই আমরা কিনে রেখেছিলাম। আসব আসব করেও আসা হচ্ছিল না—'

বম্বেতে ঠিক এভাবে কেউ আলাপ-টালাপ করে না। এখানে যে যার ধান্দায় ঘুরছে। যদিও সব ব্যাপারেই পাবু উদাসীন এবং কৌতূহল-শূন্য, তবু এই আশ্চর্য সাবলীল মেয়েটাকে বেশ ভাল লাগছে। পাবু বলল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন ফ্ল্যাটটা খালি পড়ে ছিল।'

উচ্ছ্বাসের গলায় জুলি বলল, 'জায়গাটা ফাইন; চারদিকে কি বিউটিফুল প্যানারমিক ভিউ।'

কাল সেই মধ্যবয়সী সঙ্গীটার কাছে ঠিক এইরকম উচ্ছ্বাসই প্রকাশ করেছিল জুলি। পাবু বলল, 'হ্যাঁ, এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডটা সত্যিই সুন্দর।'

'আচ্ছা, সামনে ওই রাস্তাটা ডানদিকে কোথায় গেছে?'

'ডাণ্ডা হয়ে জুহু বীচের দিকে—'

'আর বাঁ ধারে?'

'মাহিম ক্রীক।'

'আচ্ছা, আমাদের এই অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসটার পেছন দিকে কী আছে?'

পাবু বলল, 'মাউণ্ট মেরি চার্চ।'

'মাউণ্ট মেরি এখানে! কি ভাবে যেতে হয়?'

'সী সাইড রোডে নামলেই ডানদিক দিয়ে একটা রাস্তা পাহাড়ে উঠেছে, সেটা ধরে উঠে গেলেই মাউণ্ট মেরি।'

পাবু কথা বলছিল ঠিকই কিন্তু আবছাভাবে জুলির সঙ্গী সেই লোকটা, আদভানি যার নাম, তার কথা ভাবছিল। লোকটা গেল কোথায়? তাকে তো দেখা যাচ্ছে না। পাবু একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে। পরক্ষণেই মনে হল এভাবে জিজ্ঞেস করাটা দারুণ অভদ্রতা।

জুলি বলল, 'এখানে আসার পর আপনার সঙ্গেই আমার প্রথম আলাপ হল।'

'তাই নাকি! দেন আই অ্যাম প্রেটি লাকি—'

জুলি হাসল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'ওই দেখুন, আমরা এতক্ষণ বকবক করে যাচ্ছি অথচ কেউ কারো নাম জানি না। আই অ্যাম জুলি—'

'আমার নাম পাবু। অন্য একটা নামও আছে, রাজীব।'

'পাবু ইজ বেটার।'

পাবু আবার কি বলতে যাচ্ছিল, হরিশের গলা ভেসে এল, 'দাদা, ব্রেকফাস্ট দে দিয়া—'

পাবু পেছন ফিরে একবার তাকিয়ে জুলিকে বলল, 'ডাকছে; যাই—'

'ও-কে, পরে আবার দেখা হচ্ছে তো?'

'পাশাপাশি ফ্ল্যাটে যখন আছি নিশ্চয়ই হবে '

ডাইনিং রুমে এসে পাবু অবাক। মা টেবলের একধারে বসে আছে। এত তাড়াতাড়ি যে তার ঘুম ভাঙবে পাবু ভাবতে পারে নি। মা'র চোখ লালচে, ফোলা ফোলা। যদিও এর মধ্যেই স্নান সেরে শাড়ি-টাড়ি বদলে নিয়েছে, হাল্কা একটু প্রসাধনও করেছে, সারা গা থেকে তার মিষ্টি গন্ধ আসছিল, তবু কালকের নেশার ঘোরটা পুরোপুরি কাটে নি।

চুপচাপ উল্টোদিকের একটা চেয়ারে বসল পাবু। হরিশ ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে দূরে কিচেনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

রুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে মা বলল, 'মহাবলেশ্বর থেকে ফিরতে বড্ড দেরি হয়ে গেল। তোর নিশ্চয়ই ভাবনা হচ্ছিল?'

পাবু উত্তর দিল না।

মা আবার বলল, 'এক' দিন ভাল ছিলি তো?'

পাবু গলার ভিতর অস্পষ্ট শব্দ করল।

রুটিতে মাখন লাগানো হয়ে গিয়েছিল। টোস্ট এবং ডিমের পোচে নুন আর গোলমরিচ ছড়াতে ছড়াতে মা বলল, 'তুই দিন দিন যেন কিরকম হয়ে যাচ্ছিস পাবু। গুম হয়ে থাকিস। কথা বলিস না। কী হয়েছে তোর?'

পাবু টোস্টের ওপর একটুকরো পোচ তুলে মুখে পুরল। চিবুতে চিবুতে বলল, 'কিছুই হয় নি।'

'তোর বয়েসী অন্য ছেলেরা তোর মতো না। তারা কেমন হাসি-খুশি, টগবগে, হুল্লোড়বাজ—'

'আমার ওসব হুল্লোড়-টুল্লোড় ভাল লাগে না।'

মা'র মন-মেজাজ ভাল থাকলে এক-আধদিন পাবুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলে। তখন তাকে রীতিমত আন্তরিক মনে হয়। মা বলল, 'তা কেন ভাল লাগবে! দিনরাত বুড়োদের মতো ঘরে বসে থাকা!'

পাবু চুপ। খেতে খেতে মা এবার বলল, 'পড়াশোনাটাও বন্ধ করে দিলি; এভাবে বসে থাকার কোন মানে হয়!'

পাবু ঘাড় গোঁজ করে খেয়ে যেতে লাগল।

মা বলল, 'আবার পড়বি? তা'হলে কলেজে ভর্তি করে দিই।'

'না। ভাল লাগে না।'

'বেশ তো, না পড়িস চাকরি-টাকরি কর। নইলে অন্য কোন লাইনে যা। সেই যে অ্যাড ফিল্মে অ্যাক্টিং করিস মাঝে মাঝে; সীরিয়াসলি তাই কর।'

পাবু চুপ।

মা বলতে লাগল, 'লাইফটাকে এভাবে নষ্ট করে দেবার কোন মানে হয় না। তুই কী করতে চাস বল্। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।'

পাবু রূঢ় গলায়-বলল, 'তোমায় কিছু করতে হবে না। কিছু করতে চলে আমিই করব।'

ছেলের অসন্তুষ্ট বিরক্ত মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে মা বলল, 'বেশ।'

কিছুক্ষণ অদ্ভুত নীরবতা।

তারপর হঠাৎ পাবু একসময় বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলব?'

'কী?'

'দয়া করে আমার জন্যে তুমি আর ভেবো না।'

'ভাবব না, বলিস কী! হাজার হোক আমি তোর মা।'

অস্পষ্ট চাপা গলায় পাবু বার কয়েক উচ্চারণ করল, 'মা! মা! মা!'

ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠেছিল। মা প্রসঙ্গটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল। বলল, 'পাশের ফাঁকা ফ্ল্যাটটায় নাকি লোক এসেছে—হরিশ বলছিল।'

'হ্যাঁ।'

'কারা এল?'

'আমি কি করে জানব?'

'দেখিস নি?'

'না।' খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। পাবু রুমালে মুখ মুছে উঠে পড়ল।

নিজের ঘরে এসে খানিকটা সময় লক্ষ্যহীনের মতো এলোমেলো ঘুরে বেড়াল পাবু। ঘুরতে ঘুরতেই একবার ভাবল, বাইরের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ায়। পরক্ষণেই সেই মেয়েটা অর্থাৎ জুলির মুখ মনে পড়ে গেল। একটু আগেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছে। আবার যদি সে ওখানে যায় এবং জুলির সঙ্গে দেখা হয়, সে হয়তো ভাববে তারই জন্য পাবু বারবার ওখানে যাচ্ছে। তাই সে ব্যালকনিতে গেল না। একসময় তার কট-এ গিয়ে শুয়ে পড়ল। বিছানাতেই অনেকগুলো ফ্যাশান ও সিনেমা ম্যাগাজিন ছড়ানো ছিল। একটার পর একটা তুলে নিয়ে সে পাতা ওল্টাতে লাগল।

ম্যাগাজিন দেখতে দেখতেই পাবু টের পেল সেই বাস্টার্ডটা—ব্রিজেশ সিং—এসেছে। লোকটা সোজা মা'র ঘরে চলে গেল। লোকটার আসা-যাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যে যখন খুশি আসে।

ঘণ্টাখানেক পর হঠাৎ মা'র গলা ভেসে এল, 'পাবু—পাবু—'

চমকে মুখ তুলতেই পাবু দেখতে পেল ডানদিকে তার ঘর থেকে প্যাসেজে যাবার দরজাটা যেখানে মা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, তার পিছনে ব্রিজেশ সিং।

মা বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি ; ফিরতে দেরি হবে। তুই খেয়ে নিস।'

পাবু উত্তর দিল না ; ব্রিজেশ সিংকে নিয়ে মা চলে গেল।

মা যাবার পরও পাবু শুয়েই আছে। এখন আর ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে না সে ; দূরমনস্কের মতো কাচের দরজা-জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখছে।

আচমকা ছুটতে ছুটতে হরিশ ঘরে এসে ঢুকল। তাকে দারুণ উত্তেজিত দেখাচ্ছে। খুব কাছে এসে ডাকল, 'দাদা—দাদা—'

পাবু তাকাল, 'কী বলছিস?'

'ও মেমসাব আয়ী হ্যায়। তুমহারি বাত পুছতি—'

'কোন্ মেমসাহেব আবার আমার কথা জিজ্ঞেস করছে?'

'ওহি ; ডাইনাবালা ফ্ল্যাটমে যো আয়ি ; নয়া মেমসাব—'

দ্রুত উঠে বসল পাবু। নিশ্চয়ই জুলির কথা বলছে হরিশটা ; তবু আরো নিশ্চিত হবার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'কাল যারা এসেছে?'

'হাঁ—হাঁ—' হরিশ ব্যস্তভাবে জানাল, তাদের ফ্ল্যাটের বাইরে মেমসাব দাঁড়িয়ে আছে।

পাবু তাড়াতাড়ি উঠে বাইরের দরজার কাছে এল। সত্যিই জুলি।

পাবু অবাক। সকালবেলা যার সঙ্গে সামান্য আলাপ হয়েছে সে যে দু ঘণ্টা পর তার খোঁজে চলে আসবে, কে ভাবতে পেরেছিল। পাবু বলল, 'আপনি!'

জুলি হাসল, 'হ্যাঁ আমিই। আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম।'

'মোটেও বিরক্ত হই নি। আসুন, ভেতরে আসুন।'

'আবার ভেতরে যাব? এখান থেকেই কথাটা বলে চলে যাই।'

'না না আসুন।' জুলিকে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল পাবু। একটা সোফা দেখিয়ে বলল, 'বসুন—'

জুলি বসলে পাবু তার কট-এ গিয়ে বসল। হরিশ ওদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। বলল। 'কফি লাগাউ দাদা?'

পাবু বলল, 'হ্যা হ্যাঁ' নিশ্চয়ই—'

জুলি বলল, 'আমি কিন্তু কিছু খাব না।'

'তাই কখনো হয়। প্রথম দিন এলেন, এন্টারটেন করতে না পারলে খুব খারাপ লাগবে।'

জুলি হাসল। হরিশ প্রায় উড়তে উড়তে কিচেনে চলে গেল।

পাবু বলল, 'এবার বলুন, কি জন্যে আমার খোঁজ করছিলেন—'

জুলি বলল, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি, ভেবে ভেবে ধার করে ফেলেছি।'

'তাই নাকি! কোথায় দেখেছেন?'

'সিনেমায়। পরশুদিন পিকচার দেখতে গিয়েছিলাম। আসল ছবিটার আগে একটা অ্যাডভার্টাইসমেণ্ট ফিল্মে আপনাকে দেখেছি। আপনাকে দারুণ স্মার্ট দেখাচ্ছিল।'

'রীয়ালি?'

'রীয়ালি।'

'থ্যাঙ্কস—'

জুলি জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাড-ফিল্মে রেগুলার অভিনয় করেন নাকি?'

পাবু মাথা নাড়ল, 'না' মাঝে মাঝে।'

জুলি মেয়েটা ছটফটে ধরনের। কথা বলতে বলতেই সে উঠে পড়ল। একবার ব্যালকনিতে গেল; একবার প্যাসেজের দরজার কাছে গিয়ে ওধারের ঘরগুলোয় উঁকি মেরে এল। তারপর সেই সোফাটায় আবার বসতে বসতে বলল, 'আপনাদের ফ্ল্যাটটা আমাদেরটার মতোই।'

'হ্যা' এ বাড়ির সব ফ্ল্যাটই একরকম।'

এই সময় হরিশ ট্রেতে করে কফি স্যাণ্ডউইচ আর প্যাস্ট্রি নিয়ে এল। জুলি শুধু কফিই নিল; অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও খাবার ছুঁল না। হেসে বলল, 'শুধু স্যাণ্ডউইচ আর প্যাস্ট্রি দিয়ে এন্টারটেন করবেন, অত বোকা আমি না। খাওয়াটা পাওনা থাক।'

পাবু বলল, 'বেশ তো' আপনার সুবিধামতো বলবেন। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব। হরিশটা ফার্স্ট ক্লাস কুক; দেখবেন কি রকম খাওয়ায়—'

হরিশ ক্লাউনের মত মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'চাইনীজ, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, বাঙ্গালী—যে খানা বলবেন মেমসাব, পাকিয়ে দেব।'

জুলি নকল বিস্ময়ের স্বরে বলল, 'তুমি এত সব রাঁধতে পারো! ও-কে, কী ডিশ খাব, ভেবে পরে বলব।'

'ঠিক হায় মেমসাব—' মাথার টুপিটা সামনের দিকে টেনে অনেকখানি ঝুঁকে স্যালুট করল হরিশ।

ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেলে জুলি, 'ফানি চ্যাপ—

পাবু হরিশকে বলল, 'তুই এখন ভাগ তো—'

'ও-কে বস্—' আরেকবার স্যালুট করে হরিশ কিচেনের দিকে চলে গেল।

একটু চুপ। তারপর জুলি জিজ্ঞেস করল, 'এখানে আপনারা কে কে থাকেন?'

'মা, আমি আর ওই হরিশ—'

'আপনার মাকে তো দেখছি না।'

'বেরিয়ে গেছে।'

কি ভেবে জুলি বলল, 'বেরিয়ে গেছে মানে উনি চাকরি-টাকরি করেন নাকি?'

মা'র কথা উঠলেই দারুণ বিতৃষ্ণা বোধ করে পাবু। জড়ানো গলায় কিছু একটা উত্তর দিল সে।

জুলি কি বুঝল সে-ই জানে; এ ব্যাপারে আর কোন প্রশ্ন করল না।

আরো কিছুক্ষণ এলোমেলো গল্প করে জুলি চলে গেল। ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে পাবু ফিরে আসছে, কিচেন থেকে হরিশটা টুক করে বেরিয়ে এসে ওর গায়ে ঝুলতে ঝুলতে ঘরে এল। গলার স্বরটাকে অদ্ভুত মজাদার করে সে বলল, 'তু নে কামাল কর দিয়া দাদা—'

পাবু ভুরু কুঁচকে বলল, 'কামাল কর দিয়া!'

'ইয়েস দাদা।' নেচে লাফিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করে হরিশটা যা বলল তা এই রকম—ফিল্ম-অ্যাকট্রেসের মত দেখতে পাশের ফ্ল্যাটের এই নয়া লড়কি নিজের থেকে গল্প করতে এসেছে; নিশ্চয়ই পাবুকে দেখে সে ফেঁসে গেছে। এখন পাবু একটু ইচ্ছা করলেই ওকে খেলিয়ে তুলতে পারবে—ইত্যাদি ইত্যাদি। সিনেমা দেখে ছোকরার বারোটা বেজে গেছে। পাবু বলল, 'মারব এক থাপ্পড়—'

'আরে বাপ্ রে—' এক লাফে হরিশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে বলল, 'একটা ভাল কথা বললাম তবু মারতে চাইছ! অলরাইট বস্—' টুপিটা সামনে টেনে ক্লাউনের মতো ঝুঁকে স্যালুট করল হরিশ।

'তবে রে উল্লুক—' হরিশকে তাড়া করতে গিয়েও হেসে ফেলল পাবু।

জুলি সেই যে সেদিন পাবুদের ফ্ল্যাটে এসেছিল তারপর দিন-চারেক কেটে গেছে। সেই একবারই মাত্র ; আর আসে নি সে। না এলেও সমুদ্রের দিকের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রোজই সকাল বিকেল ওরা অনেকক্ষণ গল্প করে। কথায় কথায় পাবু জেনেছে, এই ফ্ল্যাটটা জুলির এক কাকার। কাকা বিজনেসম্যান, সে এখানে থাকে না। তবে প্রায়ই জুলিকে দেখতে আসে। দিনের বেলা কাজকর্মের জন্য কাকার পক্ষে আসা সম্ভব হয় না ; সে আসে রাত্রে। রাতটুকু ভাইঝির কাছে কাটিয়ে ভোরেই আবার চলে যায়।

কাজেই ওই ফ্ল্যাটটায় বলতে গেলে জুলি একলাই থাকে। অবশ্য রান্না এবং অন্য সব কাজের জন্যে মাঝবয়সী শক্তসমর্থ একটি মারাঠী মেয়েমানুষ আছে। কোন কোন দিন রাত্রে জুলিদের ফ্ল্যাটে যে অন্য লোক আসে, নিজের ঘর থেকে টের পায় পাবু। তখন অনেক রাত পর্যন্ত ওদের ফ্ল্যাটে আলো জলে ; রেডিওগ্রাম চলার আওয়াজ কিংবা কথাবার্তার অস্পষ্ট টুকরো ভেসে আসে।

জুলির কাকাকে এখনও ছাখে নি পাবু। তবে এটুকু জেনেছে জুলি গোয়ার রোম্যান ক্যাথলিক কৃশ্চান ; তার মা-বাবা মার্মুগাঁও-এর কাছে একটা গ্রামে থাকে।

জুলিরা যদি ক্যাথলিক খৃস্টান হয় তবে প্রথম দিন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পাবু যাকে দেখেছিল সেই সিন্ধী আদভানী কে ? এ কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করে নি পাবু। আরো একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, জুলি একদিনও তাকে ওদের ফ্ল্যাটে যেতে বলে নি।

এখন ঠিক দুপুরও না, আবার বিকেলও না। সময়টা দুয়ের মাঝখানে থমকে আছে। অন্যদিন এই সময়টা শুয়ে থাকে পাবু। হয় ঘুমোয়, নইলে থ্রিলার-ট্রিলার পড়ে। আজ কিছুই আর ভাল লাগছিল না। সে গিয়ে পশ্চিমের ব্যালকনিতে দাঁড়াল।

পাবু যাবার মিনিট দশেক পর জুলি ওদের ব্যালকনিতে এল। পাবু তাকিয়েই হাসল, বলল, 'সময় কাটাবার জন্য ক্রশওয়ার্ড পাজ্‌ল নিয়ে বসেছিলাম। আপনাকে দেখে বেরিয়ে এলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, ভাবলাম একটু সঙ্গ দেওয়া যাক।'

পাবু বলল, 'থ্যাঙ্কস্‌—'

'অন্যদিন তো দুপুরবেলায় পড়ে পড়ে ঘুমোন; আজ কী হল?'

'ঘুম হল না।'

একটু ভেবে জুলি বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

পাবু বলল, 'মনে করব কেন, কি জানতে চান বলুন—'

'এখানে আসার পর থেকে দেখছি, আপনি প্রায় সারাদিনই ফ্ল্যাটে থাকেন; বিশেষ বেরোন-টেরোন না—'

'বেরুবার দরকার হয় না।'

কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থেকে জুলি বলল, 'আর ইউ এ স্টুডেন্ট?'

পাবু বলল, 'কোন একসময় ছিলাম।'

'চাকরি-টাকরি করেন?'

'না কিছুই করি না। ইন ফ্যাক্ট কিছু করতেই ভাল লাগে না।'

জুলি আর কোন প্রশ্ন করল না।

পাবু এবার বলল, 'আমিও মার্ক করেছি, আপনিও ফ্ল্যাট ছেড়ে নড়েন না।'

জুলি বলল, 'আফটার অল আমি একটা মেয়ে।'

'মেয়েরা বুঝি ঘর থেকে বেরোয় না!' পাবু জুলির চোখের ভেতরে তাকাল, 'দিস ইজ বম্বে ম্যাডাম, এখানে পুরুষদের চাইতে মেয়েরাই বাইরে থাকে বেশি।'

জুলিকে বিব্রত দেখাল, বলল, 'না, মানে আমার আঙ্কল বাইরে ঘোরাঘুরি তেমন পছন্দ করেন না।'

'কনজারভেটিভ?'

'কিছুটা।'

খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর পাবু প্রশ্ন করল, 'আপনার স্টুডেন্ট লাইফ কি শেষ হয়ে গেছে?'

জুলি মাথা নাড়ল, অর্থাৎ তা-ই। পরক্ষণেই কি মনে পড়তে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তবে ওয়েস্টার্ন ড্যান্সের স্কুলে ভর্তি হবার ইচ্ছে আছে। ড্যান্স আমার খুব ফেভারিট।'

'ইচ্ছে যখন আছে, ভর্তি হয়ে যান।'

'দেখা যাক—' বলতে বলতেই সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে জুলি। চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখুন দেখুন—'

এখন, দুপুর-বিকেলের মাঝামাঝি এই সময়টায় ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের রাস্তা বেশ নির্জন। নভেম্বরের উজ্জ্বল রোদে ঘরবাড়ি, গাছপালা, সমুদ্র সব ভেসে যাচ্ছে।

উল্টোদিকের রেস্তোরাঁটার ওধারে সারা আকাশ উড়ে ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ছিল। কত যে পাখি, হাজার নাকি লক্ষ, কিংবা অর্বুদ, কে গুনে দেবে। পাখিদের দিকে তাকিয়ে চোখ আর ফেরানো যাচ্ছে না।

পাখি দেখতে দেখতে জুলি হঠাৎ বলল, 'এখন আর ফ্ল্যাটে বসে থাকতে একদম ভাল লাগছে না।'

পাবু বলল, 'বেশ তো, বেরিয়ে পড়ুন।'

'আপনি যাবেন? চলুন না—খানিকটা বেড়িয়ে আসি। ঘরে থেকে থেকে ভীষণ একঘেয়ে লাগছে।'

আচমকা পাবুর শরীরে বিদ্যুৎ-চমকের মত কিছু খেলে গেল। খুব আগ্রহের গলায় সে বলল, 'চলুন। কিন্তু—'

'কী '

'আপনার কনজারভেটিভ আঙ্কল—'

জুলির মুখে মুহূর্তের জন্য গাঢ় ছায়া পড়ল। তাকে চিন্তান্বিত দেখাল। তারপরেই দু-হাতে সব ভাবনা ঠেলে দিয়ে সে বলল, 'সন্ধ্যের আগে আগেই ফিরে আসব; আঙ্কল টের পাবে না। আপনি আসুন, আমি বেরুচ্ছি।'

ফ্ল্যাটের বাইরে আসতেই পাবু দেখতে পেল জুলি তার জন্য লিফ্‌ট বক্সের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে এগিয়ে গেল। কিন্তু ওরা লিফটে উঠতে পারল না। কেননা সেটা তাদের এই ফ্লোরে থামছেই না। সট সট করে একবার ওপরে উঠছে, আবার হুড় হুড় করে নেমে যাচ্ছে।

চোখ কুঁচকে পাবু বলল, 'নো হোপ, নিশ্চয়ই তারা লিফ্‌টে ঢুকেছে। এক ঘণ্টার আগে বেরুবে না।'

'কারা ঢুকেছে লিফ্‌টে?'

'সিক্সটিনথ্‌ ফ্লোরের মিসেস ডুগাল আর সেভেনথ ফ্লোরের এক ছোকরা ফ্লাইট অফিসার সাহানী—'

'একঘণ্টা লিফ্‌টে থেকে ওরা কী করে?'

'প্রেম ম্যাডাম, প্রেম—পরের বউয়ের সঙ্গে সাহানী ব্যাটা দারুণ চালাচ্ছে। চলুন, এখন দেড়শো সিঁড়ি ভাঙা যাক—'

ঠোঁট টিপে হাসল জুলি; কিছু বলল না।

নিচে নামতে নামতে দেখা গেল, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে সমান বিশাল এক গুজরাতী মহিলা হাঁপাতে হাঁপাতে ওপরে উঠে আসছে। তাকে পাশ কাটিয়ে একটা ল্যাণ্ডিংয়ে এসে পাবু বলল, 'এই চীজটিকে দেখে রাখুন। শরীরের ফ্যাট কমাবার

জন্য দিনে কুড়ি পঁচিশ বার সিঁড় ভেঙে এই আঠারো-তলা বাড়িটার মাথায় ওঠে, আবার নিচে নামে।'

জুলি বলল, 'ওহ্ গড, শী উইল ডাই—'

পাবু বলল, 'নট নাউ ; পঞ্চাশ বছর পর।'

সী সাইড রোডে এসে যেখানে আকাশ জুড়ে পাখি উড়ছিল, প্রথমে ওরা সেখানে গেল। কিছুক্ষণ পাখি দেখল। তারপর রাস্তা থেকে নিচে নেমে এবড়ো খেবড়ো পাথর টপকে ব্যাক বে'র জলের কাছে এল। এবং জলে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে ডাঙার দিকে অনেক দূর চলে গেল ; তারপর আবার ফিরে এসে রেস্তোরাঁটার ওধারে জলের কাছে পাশাপাশি বসল। জুলি শুধু বলতে লাগল, 'কি ভাল যে লাগছে, কি ভাল যে লাগছে !'

পাবু বলল, 'আমারও আমারও—'

অনেকক্ষণ পর সূর্যটা যখন সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছে, রোদের রঙ বাসি হলুদের মতো হয়ে আসছে, সেইসময় হঠাৎ কি মনে পড়ে যেতে জুলি বলল, 'আচ্ছা, মাউণ্ট মেরি চার্চটা তো কাছেই—আমাকে নিয়ে যাবেন ?'

'গ্ল্যাডলি। চলুন—'

ওরা উঠে পড়ল। তারপর সী সাইড রোডে এসে সামনেই পাহাড়ের গা বেয়ে যে রাস্তাটা ওপরে উঠেছে সেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাবু বলল, 'আপনি খুব রিলিজিয়াস মাইণ্ডেড, না ?'

জুলি অল্প হাসল, 'জানি না। তবে চার্চে যেতে আমার খুব ভাল লাগে।'

মাউণ্ট মেরি চার্চে ঢুকবার মুখে বুড়ো জেকবের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। ম্যাণ্ডোলিন হাতে ঝুলিয়ে সে নেমে আসছে। চোখ খারাপ হলেও দিনের বেলা সে কিছুটা দেখতে পায়। পাবুদের দেখে জেকব থেমে গেল।

পাবু বলল, 'কেমন আছ আঙ্কল ?' বলতে বলতে একটা টাকা জেকবের পকেটে গুঁজে দিল।

জেকব বলল, 'বাই দা গ্রেস অফ গড আমি সবসময় ভাল থাকি। তুমি কেমন আছ বল।'

'ওই একরকম।'

'তোমার মা ?'

জেকবের প্রশ্নটার মধ্যে বিশেষ একটা ইঙ্গিত ছিল, পাবু বুঝতে পারল। চাপা গলায় বলল, 'নো চেঞ্জ।'

'স্যাড, ভেরি স্যাড—'

কথা বলতে বলতে জুলিকে দেখতে পেয়েছিল জেকব। কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'এই মেয়েটি ?'

পাবু বলল, 'এ জুলি—' একটু থেমে, 'আমার বন্ধু বলতে পারো।'

'খুব ভাল' খুব ভাল। গড ব্লেস ইউ—' ম্যাণ্ডোলিন বাজাতে বাজাতে জেকব ঢালু রাস্তা বেয়ে নিচে নামতে লাগল।

চার্চের ভেতর যেতে যেতে জুলি বলল, 'লোকটা কে ?'

পাবু জেকবের মোটামুটি পরিচয় দিল।

জুলি বলল, 'চমৎকার লোকটা না ?'

'হ্যাঁ।' তারপর একটু চুপ করে থেকে পাবু বলল, 'আমি কিন্তু জেকব আঙ্কলকে বলে ফেলেছি, আপনি আমার বন্ধু—'

'তাতে কি হয়েছে। আমি আপনার বন্ধুই তো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

চার্চের শান্ত পবিত্র নির্জন কম্পাউণ্ডের ভেতর ওরা খানিকটা সময় ঘুরে বেড়াল। এখানকার নির্জনতা, পবিত্রতা এবং অপার শান্তি যেন ওদের স্পর্শ করে যাচ্ছিল। জুলি খুব আস্তে করে বলল, 'এখানে এলে মন জুড়িয়ে যায়, না ?'

'হুঁ।'

'আচ্ছা' আমি শুনেছি এই মাউণ্ট মেরিতে এসে মন প্রাণ দিয়ে কিছু চাইলে নাকি পাওয়া যায়, সত্যি ?'

'জানি না। আমি কোনদিন কিছু তো চাই নি।'

জুলি আর কিছু বলল না।

একটু পর যেখানে মেরি আর যীশু খ্রীষ্টের ছবি আছে ওরা সেখানে এল। মেরির ছবির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পাবু লক্ষ্য করল, জুলির চোখদুটো বোজা ; মুখ বিষণ্ণ করুণ, খুব তন্ময় হয়ে নিঃশব্দে কি যেন বলছে সে, কথাগুলো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না ; ঠোঁটদুটো অল্প অল্প নড়ছে তার।

জুলিকে দেখতে দেখতে পাবুর স্মৃতির তলা থেকে অনেকদিন আগের একটা ছবি লাফ দিয়ে উঠে এল। আম্বেদকর রোডে থাকতে এক-এক দিন মা তাকে নিয়ে এই মাউণ্ট মেরিতে চলে আসত আর ঠিক জুলির মতো তন্ময় হয়ে মেরির ছবির কাছে দাঁড়িয়ে থাকত ; তার চোখ বেয়ে সমানে জল পড়ত তখন। কতকাল হয়ে গেল, মা আর মাউণ্ট মেরিতে আসে না।

এদিকে সন্ধ্যে নেমে আসছিল। সূর্যটা আর নেই ; চারধার দ্রুত ঝাপসা

হয়ে যাচ্ছে। জুলির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দারুণ এক অস্থিরতা অনুভব করতে লাগল পাবু।

হঠাৎ একসময় চার্চের ভেতর কোথায় যেন প্রার্থনার সুর শোনা গেল। জুলি চমকে উঠল, খানিক আগের নিবিষ্ট ভাবটা কেটে গেছে। দ্রুত চারিদিক একবার দেখে নিয়ে সে বলল, 'ইস, অন্ধকার হয়ে গেল। চলুন—ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে।'

পাবু বলল, 'আরেকটু থাকুন না।'

'না না, আর এক সেকেণ্ডও আমি ঘরের বাইরে থাকতে পারব না।'

জুলিকে ভীষণ উদ্বিগ্ন এবং ভীত দেখাচ্ছে। তার দিকে তাকিয়ে পাবু কিছু বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'আচ্ছা চলুন—'

চার্চ থেকে বেরিয়ে সেই খাড়াই রাস্তাটা ধরে নিচে নামতে নামতে পাবু জিজ্ঞেস করল, 'একটু আগে মেরির ছবির কাছে দাঁড়িয়ে চোখ বুজে কী চাইছিলেন?'

জুলি হকচকিয়ে গেল। তখুনি কিছু বলল না। বড় বড় পা ফেলে খানিকটা নিচে নেমে গিয়ে শ্বাস টানার মতো শব্দ করে বলল, 'চাইলাম মুক্তি।'

'মুক্তি! কিসের?'

'আপনি বুঝবেন না। যদি কোনদিন তেমন সময় আসে বলব।'

ঘাড় ফিরিয়ে জুলিকে একবার দেখে নিল পাবু। অন্ধকারে তার চোখ মুখ ঠোঁট চিবুক স্পষ্ট করে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মেয়েটাকে অদ্ভুত রহস্যময়ী মনে হতে লাগল পাবুর।

অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ফিরে ওরা দেখল, লিফ্টটা চালু নেই। পাবু আর জুলি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

পাবু বলল, 'আজকের বিকেলটা ফাইন কাটল।'

অন্যমনস্কের মত জুলি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ—'

পাবু আবার বলল, 'মাঝে মাঝে এ রকম বেরিয়ে পড়লে হয়।'

আগের সুরেই জুলি বলল, 'হ্যাঁ—'

পাবু লক্ষ্য করল, তার কথা ভাল করে শুনছে না জুলি। দারুণ এক উৎকণ্ঠা মেয়েটাকে ঘিরে আছে যেন। পাবু আর কিছু বলল না।

সিক্সথ্ আর সেভেন্থ্ ফ্লোরের মাঝামাঝি যে বাঁকটা, সেখানে এসে পাবুকে থমকে যেতে হল। মা ল্যাণ্ডিং-এর কাছটায় পড়ে আছে। প্রচুর হুইস্কি টেনেছে সে; মুখ থেকে ভকভক করে গন্ধ বেরিয়ে আসছে, চোখ লাল; জামা-কাপড়

এলোমেলো। নেশায় সে এমন চুর যে সিঁড়ি ভেঙে আর ওপরে উঠতে পারে নি ; এখানেই শুয়ে পড়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, যে ব্রিজেশ সিংটা গায়ের চামড়ার মতো মায়ের সঙ্গে সর্বক্ষণ লেগে থাকে তাকে এখন দেখা যাচ্ছে না।

মা পাবুকে দেখতে পেয়েছিল ; জড়ানো গলায় বলল, 'পাবু, প্লীজ আমাকে একটু ফ্ল্যাটে নিয়ে চল—'

এ অবস্থায় মাকে ফেলে যাওয়া যায় না। পাবু চোখের ইশারায় জুলিকে চলে যেতে বলে মা'র কাছে গেল। জুলি আর দাঁড়াল না ; এক এক লাফে দু-তিনটে করে সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠতে লাগল।

পাবু মাকে ল্যাণ্ডিং থেকে টেনে তুলল, তারপর ধরে ধরে ওপরে নিয়ে যেতে লাগল। তার চোখে মুখে এখন প্রচণ্ড ঘৃণা আর বিরক্তি। তার জন্মদাত্রী এই মহিলাটিকে একেবারেই সহ্য করতে পারে না পাবু।

উঠতে উঠতে মা বলল, 'ভাগ্যিস তুই এসে গিয়েছিলি, নইলে এই সিঁড়িতেই পড়ে থাকতে হত। এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের লোকগুলোকে তো জানি ; একেকটা বাস্টার্ড। কেউ পড়ে থাকুক, মরে যাক, ফিরেও তাকাবে না।'

পাবু বলল, 'রোজ রোজ তুমি ড্রিংক করে আসো কেন ? স্ট্যাণ্ড করতে পারো না, তবু—'

'অভ্যাস, বুঝলি—অভ্যাস। জানিসই তো, হ্যাবিট ইজ দি সেকেণ্ড নেচার।'

পাবু আর কিছু বলল না। মা তার গায়ের ওপর প্রায় সমস্ত শরীরের ভার চাপিয়ে টলে টলে উঠতে উঠতে জড়ানো স্বরে সমানে বকে যেতে লাগল।

ফ্ল্যাটে এসে মাকে তার ঘরে বিছানায় শুইয়ে দিল পাবু।

মা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মাই বয়—'

পাবু উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এল।

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল পাবুর। শুয়ে থাকতে থাকতেই সে টের পেল, হরিশটা ছ্যাঁক-ছোঁক আওয়াজ করে কিচেনে কি যেন করছে। খানিকটা পর সে দেখল, মা ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গেল। এত সকালে, এখনও রোদ ওঠে নি, মা কোথায় গেল কে জানে। যেখানে খুশি যাক ; মা'র ভাবনাটা টোকা মেরে মাথা থেকে বার করে দিল পাবু।

রোদ উঠবার পর বিছানা ছেড়ে সে গিয়ে দাঁড়াল পশ্চিমের ব্যালকনিতে। কি আশ্চর্য, জুলিও ওদের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখাচোখি হতেই জুলি হাসল, 'গুড মর্নিং—'

পাবুও হাসল, 'গুড মর্নিং—' লক্ষ্য করল, কাল সন্ধ্যার সেই উদ্বেগ এবং ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই জুলির মুখে। সে বলল, 'দেরি করে ফেরার জন্যে কাল বকুনি-টকুনি খেতে হয় নি তো?'

'না, কাল কাকা আসে নি।'

'আপনার ফ্ল্যাটে যে মেইড সারভেন্টটা কাজ করে সে বলে দেবে না তো?'

'না; ওকে পয়সা দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলেছি।'

'তা হলে আর কিছু পয়সা দিয়ে আরেকটু ম্যানেজ করুন না—আজ দুপুরবেলা আবার বেরিয়ে পড়ব।'

'রোজ রোজ রিস্ক নেওয়া কি ঠিক হবে?'

পাবু বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না; আজ সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসব।'

জুলি বলল, 'আমাদের মেইডটাকে ম্যানেজ করতে পারলে নিশ্চয়ই বেরুব। কাকার কাছে ও বড্ড লাগায়—'

'ও-কে—'

দুপুরবেলা জুলিই পাবুকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অর্থাৎ চাকরাণীটাকে পয়সা-টয়সা দিয়ে কব্জা করে ফেলেছে।

আজ ওরা গেল জুহু বীচে। সারা দুপুর সেখানে কাটিয়ে বিকেল বেলা ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে ফিরে এল।

জুলি বলল, 'চলুন একবার মাউণ্ট মেরি চার্চ থেকে ঘুরে আসি।'

পাবু বলল, 'কালই তো গিয়েছিলেন।'

'আজও একবার যাব।'

চার্চে গিয়ে কালকের মতোই মেরির ছবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তন্ময় হয়ে গেল জুলি। চোখ বুজে মনে মনে কি যেন প্রার্থনা করল। তারপর নিবিষ্ট ভাবটা কাটলে পাবুকে বলল, 'চলুন, ফেরা যাক।'

অ্যাপার্টমেণ্ট হাউসে ফিরতে ফিরতে পাবু রগড়ের গলায় বলল, 'আজ মেরির কাছে কী চাইলেন?'

বিষণ্ণ করুণ মুখে জুলি বলল, 'কাল যা চেয়েছিলাম—মুক্তি।'

পাবু লক্ষ্য করেছে এমনিতে মেয়েটা দারুণ ছটফটে এবং হাসিখুশি কিন্তু

এই চার্চে এলেই সে যেন কেমন হয়ে যায়। তখন তাকে আর বোঝা যায় না। জুলিকে ঘিরে তখন আশ্চর্য দুর্বোধ্যতা।

পরের দিন দুপুরেও ওরা বেরুল। তার পরের দিনও এবং তারও পরের দিন। অর্থাৎ দুপুর হলেই ওরা নিয়মিত বেরিয়ে পড়তে লাগল। এগারোটা বাজতে না বাজতেই জুলি ওদের ব্যালকনিতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে, 'পাবু—পাবু—'

পাবু এরই জন্য যেন অপেক্ষা করে থাকে। ছুটে তাদের ব্যালকনিতে গিয়ে বলে, 'ইয়েস ম্যাডাম—'

'আর ইউ রেডি? আর আধ ঘণ্টা পর কিন্তু বেরিয়ে পড়ব।'

'ঠিক হায় মেমসাব।'

ক'দিন মেলামেশা এবং ঘনিষ্ঠতার ফলে এখন আর তারা আপনিটাপনি করে বলে না; কবে থেকে যে তুমি-টুমি শুরু করে দিয়েছে ওদের খেয়াল নেই।

যাই হোক, কোনদিন পাবুরা বেড়াতে চলে যায় মালাবার হিল্‌সে, কোনদিন মিল্ক কলোনিতে, কোনদিন পাওয়াই লেক, কোনদিন বা ট্রম্বের দিকে অথবা বোরিভিলির ন্যাশনাল পার্কে।

যেখানেই যাক সন্ধ্যের আগে আগে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে ফিরে জুলির একবার অন্তত মাউণ্ট মেরি চার্চে গিয়ে মেরির ছবির সামনে দাঁড়ানো চাই-ই।

চার্চে ঢুকবার মুখে কোন কোন দিন জেকব বুড়োর সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায়; তবে বেশির ভাগ দিনই হয় না। যেদিন দেখা হয় সেদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ গল্প করে জেকব। এর মধ্যে জুলির সঙ্গে তার ভাল আলাপ হয়ে গেছে। নানারকম এলোমেলো কথার পর জেকব জুলিকে বলে, 'তুমি পাবুটাকে একটু দেখ। ওর যখন সাত-আট বছর বয়স তখন থেকেই ওকে চিনি; ছেলেটা বড় দুঃখী। হি ইজ ভেরি আনফরচুনেট।' বলেই ম্যাণ্ডোলিনে টুং-টাং শব্দ তুলে সামনের খাড়া রাস্তাটা দিয়ে নিচে নামতে থাকে।

একদিন বিকেলবেলা ওরা চৌপাট্টি ড্রাইভে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ পাবুর বাবা রমেশ নাদকার্ণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সঙ্গে তার দ্বিতীয় স্ত্রী।

বাবাকে দেখেই পাবুর শরীরের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল। সে তাকে এড়াতেই চেয়েছিল। এখন এই বিকেলবেলা চৌপাট্টিতে প্রচুর মানুষ; জুলিকে নিয়ে সে যখন ভিড়ের ভেতর লুকোতে চাইছে সেই সময় ধরা পড়ে গেল। দু-হাতে লোকজন ঠেলে রমেশ নাদকার্ণী প্রায় ছুটতে ছুটতে সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কি রে পাবু, আমাকে দেখে পালাচ্ছিস যে?'

পাবু অস্বস্তি বোধ করল। বিব্রতভাবে বলল, 'তোমাকে দেখতে পাই নি।'

'ও আচ্ছা, আমার মনে হল, তুই আমাকে অ্যাভয়েড করতে চাইছিস।'

পাবু উত্তর দিল না। একটা ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে, মা'র সঙ্গে ডাইভোর্স হবার আগে বাবা তার সঙ্গে বিশেষ কথা-টথা বলত না; তার প্রতি বাবার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত খারাপ—যাকে নিষ্ঠুরতাই বলা যায়। কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদের পর একেবারে বদলে গেছে বাবা। রাস্তাঘাটে কোথাও দেখা হলে বাবা নিজের থেকেই ছুটে আসে। এখন তার ব্যবহার খুবই সহৃদয় অনেকটা বন্ধুর মতো। মা'র সঙ্গে ডাইভোর্স না হলে বাবার এই চেহারাটা দেখা যেত না। কিন্তু বাবা যতই বদলাক তবু তাকে পছন্দ করে না পাবু। সেই যে ছেলেবেলায় তার মনে বাবার সম্বন্ধে ঘৃণাটা গাঢ় রঙে মুদ্রিত হয়ে আছে সেটা আজও এতটুকু ফিকে হল না।

বাবা আবার বলল, 'কেমন আছিস পাবু?'

পাবু সংক্ষেপে বলল, 'ভাল।'

'শোভা?'

'ওই একরকম।'

'মাঝে মাঝে খবর পাই, শোভাটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।'

পাবু মনে মনে উচ্চারণ করল, 'সেটা তো তোমারই জন্য রাসকেল। তুমিই মাকে শেষ করেছ।' মুখে অবশ্য কিছু বলল না।

বাবা আবার বলল, 'শোভার ওই সব খবর শুনে আমার খুব খারাপ লাগে।'

পাবু এবারও চুপ করে থাকল। বাবা বলতে লাগল, 'তুই তো যথেষ্ট বড় হয়েছিস; এখন মাকে ফেরাতে চেষ্টা কর।'

অস্পষ্ট গলায় পাবু বলল, 'তাকে ফেরানো যাবে না।'

ওদের কথাবার্তার মধ্যে কখন যেন রমেশ নাদকার্ণীর দ্বিতীয় স্ত্রী কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল; ভদ্রমহিলা পার্শী। আগেই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে পাবুর; তার নামটাও জেনে ফেলেছে—সোফিয়া।

সোফিয়া হঠাৎ বলল, 'তুমি কিন্তু খুব রোগা হয়ে গেছ পাবু।'

মহিলাটি চমৎকার। পাবু তার যেটুকু পরিচয় পেয়েছে তাতে মনে হয়েছে কথায়-বার্তায় এবং আচরণে বাবার এই দ্বিতীয় স্ত্রী অত্যন্ত মার্জিত। পাবুর প্রতি সে যথেষ্ট স্নেহশীলাও। মহিলাটিকে পাবুর ভাল লাগে।

পাবু হাসল, 'কোথায় রোগা হয়েছি! আপনার সঙ্গে লাস্ট দেখা হবার পর আমার ওয়েট এক গ্রামও কমে নি।'

'খালি পাকা পাকা কথা।' সোফিয়া সস্নেহে হাসল, 'তুমি কিন্তু একদিনও আমাদের বাড়ি গেলে না। কতদিন আশা করেছি, তুমি আসবে।'

'যাব একদিন।'

'সেই একদিনটা কবে? তুমি আমাকে একটা ডেফিনিট ডেট দাও।'

'ডেট দিতে হবে না; দেখবেন হুম করে একদিন হাজির হয়েছি।'

'খালি অ্যাভয়েড করার মতলব।' বাবাকে দেখিয়ে সোফিয়া গভীর গলায় বলল, 'এই ভদ্রলোক তো সকালবেলা বেরিয়ে যায়, ফিরতে ফিরতে সেই রাত। আমাকে একা একা থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তুমি এলে আমার ভাল লাগত।' পাবু জানে নিজের উচ্চাশার জন্য মা'র মতো এই মহিলাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে নি বাবা। অবশ্য ভদ্রমহিলার প্রচুর বয়স হয়েছে। এত বয়সে ফাঁদ পাতবার মতো তার শরীরে আছেই বা কি?

এতক্ষণ বাবা লক্ষ্য করে নি, হঠাৎ পাবুর পেছনে জুলিকে আবিষ্কার করে সে বলে উঠল, 'এই মেয়েটি কে রে পাবু?'

পাবু বলল, 'ও জুলি; আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকে।'

চোখের তারাদুটো কোণের দিকে এনে বাবা জিজ্ঞেস করল, 'ফ্রেণ্ড?'

'হ্যাঁ।'

সোফিয়া ওধার থেকে পাবুকে বলল, 'যখন আমাদের ওখানে যাবে, জুলিকে নিয়ে এস।' জুলিকে বলল, 'যেও কিন্তু—'

জুলি ঘাড় কাত করল, অর্থাৎ যাবে।

বাবা এদিকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সে বলল, 'যখন যাবে তখন যাবে। এখন জুলির অনারে কী করা যায় বল তো? চল কোথাও গিয়ে খাওয়া যাক—'

পাবু বলল, 'না না, আজ থাক। আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে।'

বাবা কোন কথা শুনল না। একরকম জোর করেই চার্চগেটের কাছে একটা ফ্যাশনেব্‌ল রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে বাবা বলল, 'আজকের বিকেলটা ফাইন কাটল। মাঝে মাঝে জুলিকে নিয়ে আসিস। এইরকম খানিকটা করে সময়

কাটানো যাবে।'

বাবাকে খুব আন্তরিক মনে হল। পাবু ভাবল, এই বয়সে বাবা হয়তো তার সঙ্গ কামনা করছে। বলল, 'দেখি।'

বিদায় নেবার সময় বাবা পাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, 'জুলি মেয়েটা খুব ভাল রে। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

সাবার্বন ট্রেনে বাড়ি ফিরতে ফিরতে জুলি জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক কে?'

পাবু বলল, 'আমার বাবা; তবে সেটা কোন এক অ্যাক্সিডেন্টের ফলে।'

জুলি হকচকিয়ে গেল, 'তার মানে অ্যাক্সিডেন্টালি হী ইজ ইওর ফাদার!'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'আর ওই মহিলা?'

'বাবার সেকেণ্ড ওয়াইফ।'

'তোমার মা, যিনি ওসেন বার্ডে থাকেন, তিনি?'

'তিনি এই ভদ্রলোকের ফার্স্ট ওয়াইফ অ্যাণ্ড এ ডাইভোর্সী।'

জুলি একটু ভেবে বলল, 'তোমার বাবার সঙ্গে মা'র ডাইভোর্স হল কেন?'

পাবু বলল, 'কারণ উপযুক্ত স্বামী এবং পিতা হবার যোগ্যতা আমার বাবার নেই।'

জুলি চমকে উঠল, 'তার মানে!'

সংক্ষেপে তার জীবনের কথা বলে গেল পাবু। সব শুনে গভীর সহানুভূতির গলায় জুলি বলল, 'স্যাড, ভেরি স্যাড। জেকব আঙ্কল কেন যে তোমাকে দুঃখী বলে, আনফরচুনেট বলে, এবার বুঝতে পারলাম।'

পাবু উত্তর দিল না।

নিজের জীবনের সব কথাই জুলিকে বলেছে পাবু, কিন্তু তার কথা প্রায় কিছুই জানা যায় নি। গোয়ার এক ছোট্ট দরিদ্র গ্রামে তার মা-বাবা থাকে, জুলির কে এক কাকা (এখনও তাকে ছাখে নি পাবু) তাকে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে এনে রেখেছে, তার ইচ্ছা ওয়েস্টার্ণ ড্যান্স শেখে, সন্ধ্যের পর কিছুতেই বাইরে থাকতে চায় না সে—টুকরো টুকরোভাবে জুলির সম্বন্ধে এটুকুই মাত্র জানা গেছে।

কাকার কথা যখনই পাবু জিজ্ঞেস করেছে, জুলি একই উত্তর দিয়েছে, 'কাকা

খুব ব্যস্ত মানুষ। দিনের বেলা তো আসে না, আসে মাঝ রাত্রে, আবার ভোর হতে না হতেই চলে যায়।'

'একদিনও কি দিনের বেলা আসতে নেই?'

'তা আমি কি করে বলব।'

'ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়।'

'ঠিক আছে, যেদিন দিনের বেলা আসবে সেদিন আলাপ করিয়ে দেব।'

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে পাবু, জুলি কখনও ওদের ফ্ল্যাটে যেতে বলে নি। এই নিয়ে পাবুর মনে কিছুটা দুঃখ আছে ; খানিকটা অভিমানও।

একেক দিন সারা দুপুর আর বিকেল ঘুরে অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ফিরে লিফ্‌টে ইলেভেনথ্‌ ফ্লোরে উঠতে উঠতে পাবু বলে, 'আজ চল, তোমার ফ্ল্যাটে যাই।'

ভয় পেয়ে চমকে ওঠে জুলি, 'না না, আজ থাক।'

'রোজই তো বল আজ থাক। কী ব্যাপার বল তো?' গম্ভীর মুখে পাবু বলে, 'আমার মনে হয়, তুমি কিছু লুকোচ্ছ।'

জুলি হকচকিয়ে যায়, 'না, লুকোবার কি আছে। প্লীজ ডোন্ট মাইণ্ড—'

একদিন লিফ্‌টে উঠতে উঠতে জুলি বলেছিল, 'তোমাকে একটা কথা বলব।'

পাবু জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী কথা?'

'এই আমার নিজের সম্বন্ধে।'

'বল না—'

'আজ না, সময় আসুক।'

কিন্তু সেই সময় আজও আসে নি।

যাই হোক, পাবুকে তাদের ফ্ল্যাটে না নিয়ে গেলেও জুলি কিন্তু অনেকবার পাবুদের ফ্ল্যাটে এসেছে। হরিশ তাকে চাইনীজ পাঞ্জাবী গুজরাতী—নানারকম ডিশ করে খাইয়েছে। একেক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে, রেকর্ড প্লেয়ার বাজিয়ে, ফিল্মী অভিনয় দেখে, প্রচুর হেসে এবং হাসিয়ে তবে ওঠে জুলি।

জুলি যেন আরব সাগরের এলোমেলো হাওয়া। তার সঙ্গে আলাপ হবার পর অনেক বদলে গেছে পাবু। পরিবর্তনটা নিজেই অনুভব করতে পারে সে।

আগে আগে তার কিছুই ভাল লাগত না। এই বম্বে শহরে চারিদিকে এত দৃশ্য, এত ঘটনা, এত মানুষ আর উত্তেজনা ; সে-সব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল পাবু। বিষাদ আর নিঃসঙ্গতা তাকে ঘিরে ধরেছিল যেন। একাকীত্বের শক্ত ফ্রেমটা ভেঙে জুলি তাকে খোলা হাওয়ায়, মুক্ত পৃথিবীতে বার করে নিয়ে

গেছে। এখন তার অনেক কিছুই ভাল লাগে। বিশাল আরব সাগর, ঝকঝকে নীলাকাশ, ঝাঁক ঝাঁক পাখি কিংবা মাউন্ট মেরি চার্চের পবিত্র প্রশান্ত কমপাউণ্ড —সবই তাকে আকর্ষণ করে। এমন কি মাকেও একেক সময় অসহনীয় মনে হয় না। কোন কোন সময় বাবাকেও সে ক্ষমা করে ফেলে!

প্রায় সারাদিনই হুইস্কিতে ডুবে থাকলেও পাবুর এই পরিবর্তন মা'র চোখে পড়েছে। এবং তার কারণটা যে জুলি তা-ও সে লক্ষ্য করেছে। কখনও কখনও সুস্থ স্বাভাবিক থাকলে মা বলে, 'যাক, আমি তো পারি নি; জুলিটা তবু তোকে চেঞ্জ করতে পেরেছে। আই অ্যাম থ্যাঙ্কফুল টু জুলি।'

পাবুর এই পরিবর্তনে হরিশও খুব খুশী। একেক দিন রাত্রিবেলা তার 'কট'-এর তলায় শুয়ে বলে, 'তুম কামাল কর দিয়া দাদা—'

পাবু শুধোয়, 'কিসের কামাল?'

'মালুম হোতা, জুলি মেমসাব জরুর ইয়ে ফ্ল্যাটমে পার্মানেন্টলি আ যায়েগী।'

'পার্মানেন্টলি?'

'হাঁ দাদা; শাদী হোগী, সানাই বাজেগী। কেয়া মজাদার!'

'এ্যাই রাসকেল, এ্যাই বদমাশ—' রেগে উঠতে গিয়েও হেসে ফেলে পাবু।

'কট'এর তলায় আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

দেখতে দেখতে দেড় মাসের মতো কেটে গেল। নভেম্বরের গোড়ায় জুলিরা এসেছিল, এখন ডিসেম্বর শেষ হতে চলেছে।

নিয়ম অনুযায়ী সময়টা শীতকাল। কিন্তু বম্বে শহরে হিম-টিম তেমন পড়ে না। নইলে বছরের অন্য ঋতুগুলোর সঙ্গে শীতের বিশেষ তফাত নেই।

এর মধ্যে পাবু আর জুলি একদিন মাউন্ট মেরিতে গেল। দিনকয়েক পর বড়দিন। গীর্জা পরিষ্কার করানো হচ্ছে। মিস্তিরিরা দরজা-জানলায় নতুন রঙ লাগাচ্ছে। টাটকা পেইন্ট আর বার্ণিশের গন্ধে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

চার্চে বুড়ো জেকব আর ওখানকারই একজন ফাদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নিয়মিত আসার ফলে ওই ফাদারের সঙ্গে ওদের আলাপ হয়ে গিয়েছিল।

'কেমন আছ,' 'ভাল আছি' জাতীয় সাধারণ কিছু কথাবার্তার পর ফাদার বললেন, 'সামনেই বড়দিন। এক্স-মাস ইভে তোমরা আসছ তো?'

উৎসাহের গলায় পাবু বলল, 'নিশ্চয়ই আসব।'

জুলিকে কিছু চিন্তিত দেখাল। সে বলল, 'ক্রিসমাস ইভ; তার মানে রাত্রিবেলা আসতে হবে। কিন্তু—'

পাবু বলল, 'কিন্তু কী?'

'রাত্রিবেলা বাইরে আসা আমার পক্ষে মুশকিল।'

'রোজ রোজ তো আসছ না; একটা মোটে দিন—'

জেকব বুড়োও বলল, 'হ্যা হ্যা চলে এস। তুমি গোয়াঙ্কি পিস্ত্রু; রোজ রোজ তো এক্সমাস আসে না।'

কি ভেবে জুলি বলল, 'ঠিক আছে, আসব।' তারপর পাবুকে বলল, 'তুমি কিন্তু আমাকে ডেকে নিয়ে এস—'

আরো কিছু কথা-টথা বলে পাবুরা চার্চের ভেতর চলে গেল।

আজ ক্রিসমাস ইভ। রাত বারোটার পর বড়দিন শুরু হবে। পাবু আর জুলি সেই সময়টা মাউন্ট মেরিতে যাবে। জুলির ইচ্ছা চার্চের ফাদার এবং অন্যান্যদের সঙ্গে এই উপলক্ষে ক্যারল গায়।

দুপুরবেলা এক ফাঁকে বেরিয়ে চার্চে জ্বালবার জন্য ওরা অনেকগুলো রঙীন মোমবাতি এবং প্রচুর কেক কিনল। আর কিনল ফল। কেনাকাটা করে ফিরতে ফিরতে বিকেল হয়ে গেল।

লিফ্টে করে বারো তলায় উঠে পাবু বলল, 'বারোটায় এক্সমাস শুরু হচ্ছে। আমরা একটু আগে আগেই চলে যাব। ন'টা সাড়ে ন'টায় বেরুতে পারবে?'

জুলি মাথা নাড়ল, 'পারব মনে হচ্ছে।'

'আমি তোমাকে ডাকব?'

একটু চুপ করে থেকে জুলি বলল, 'ডেকো—'

তারপর যে যার ফ্ল্যাটে চলে গেল।

ন'টা বাজলে পশ্চিমের ব্যালকনিতে গিয়ে পাবু ডাকতে লাগল, 'জুলি—জুলি—'

জুলির সাড়া পাওয়া গেল না। জুলিদের ফ্ল্যাটের এদিককার দরজা-জানালা-

গুলো বন্ধ। ভেতরে অস্পষ্ট নীলাভ আলো জ্বলছে।

পাবু আরও বারকয়েক ডাকাডাকি করে ভাবল, হয়তো জুলি ওধারের কোন ঘরে রয়েছে, তার ডাক শুনতে পায় নি। ঠিক আছে, এখন তো সবে ন'টা। খানিকক্ষণ পরে এসে আবার ডাকা যাবে।

আধঘণ্টা পর পাবুকে আবার পশ্চিমের ব্যালকনিতে দেখা গেল। সে ডাকল, 'জুলি—জুলি—'

এবারও জুলির সাড়া নেই। কী হল মেয়েটার? চার্চে যাবার কথা ভুলে গেল নাকি! ঠিক আছে, আরেকটু দেখা যাক।

দশটার সময় আবার ব্যালকনিতে এল পাবু। এবার জোরে জোরেই ডাকল, 'জুলি—জুলি—'

আগের দু'বারের মতোই ওধারের ফ্ল্যাটটা একেবারে নিশ্চুপ। জুলির কী হতে পারে, পাবু ভেবে পেল না। হঠাৎ কি মেয়েটা অসুস্থ হয়ে পড়ল? কিন্তু ক'ঘণ্টা আগেও তো তাকে টগবগে সজীব দেখা গেছে। পাবু নিজের মধ্যে অস্থিরতা অনুভব করল। এবং ঠিক করে ফেলল জুলিদের ফ্ল্যাটেই যাবে।

জুলিদের ফ্ল্যাটটার কাছে গিয়ে পাবু কলিং বেল খুঁজল, দরজার গায়েই সেটা রয়েছে, কিন্তু হাত দিতেই টের পাওয়া গেল ওটা খারাপ হয়ে গেছে। অগত্যা সে ডাকাডাকি শুরু করল, যথারীতি সাড়া নেই।

ব্যালকনির দিক থেকে সাড়া না পেয়ে পাবু ভেবেছিল জুলি হয়তো এধারে আছে। কিন্তু জুলি যে ফ্ল্যাটে রয়েছে এদিক থেকেও বোঝা যাচ্ছে না।

খানিকক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে পাবু দরজায় ধাক্কা দিল; সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে গেল। ভেতরে মুখ বাড়িয়ে পাবু কারোকে দেখতে পেল না। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রেখে জুলি আর সেই মারাঠী মেইডটা কি বেরিয়ে গেছে? পাবু আর দাঁড়াল না; দারুণ এক অস্থিরতা আর দুশ্চিন্তা নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

এই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটার সব ফ্ল্যাটই একরকম। কাজেই পাবুর অসুবিধা হল না। ভেতরে পা দিলেই লম্বা প্যাসেজ। প্যাসেজটার ডানদিকে কিচেন, বাঁদিকে ঘর, কিচেনের পর ডানদিকে পর পর আরও তিনটে ঘর।

বাঁদিকের ঘরটা ফাঁকা এবং অন্ধকার। কিচেন ছাড়িয়ে পাবু এগিয়ে গেল। কিন্তু ডানদিকের প্রথম ঘরটার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ভেতরে নীল আলো জ্বলছে। দরজায় পর্দা ঝুলছিল বলে ঘরের মধ্যে কেউ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পাবু আস্তে আস্তে পর্দাটা সরিয়েই চমকে উঠল। দূরে একটা খাটের ওপর

নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে জুলি, তার ওপর ঝুঁকে সেই মধ্যবয়সী লোকটা, আদভানী যার নাম, চুমু খেয়ে যাচ্ছে। তার গায়েও জামা-টামা কিচ্ছু নেই, একেবারে উলঙ্গ।

পাবুর মনে হল এই আঠারো তলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউসটা চরকির মতো কয়েক পাক ঘুরে গেল। তার শরীরের সব রক্তস্রোত থমকে গেছে যেন। মাথার ভেতর ঝন-ঝন করে অনবরত কি ভেঙে পড়ছে। নিজের অজান্তেই পাবুর গলা থেকে গোঙানির মতো একটা শব্দ বেরিয়ে এল। আর তখনই জুলি আর আদভানী ঘুরে তাকাল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটো নগ্ন শরীর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই আদভানী গর্জন করে উঠল, 'হু আর ইউ? ব্লাডি, বাস্টার্ড, কুত্তীকা বাচ্চা,—' উলঙ্গ অবস্থাতেই সে টলতে টলতে এগিয়ে আসতে লাগল।

পাবু তাকে গ্রাহ্য করল না। পর্দাটা সেইভাবেই ধরে থেকে একদৃষ্টে জুলির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি এইরকম, তুমি এইরকম! এইজন্যই তোমাদের ফ্ল্যাটে আমাকে আসতে দাও নি!' ঘৃণায় তার চোখ-মুখ-কণ্ঠস্বর জ্বলছিল।

দু'হাতে মুখ ঢেকে জুলি বসে ছিল। পাবু আবার বলল, 'আমি ভাবতেও পারি নি তুমি একটা প্রস্টিটিউট! ছিঃ ছিঃ—' বলেই আর দাঁড়াল না, উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেল।

পেছন থেকে জুলি ফোঁপানির মতো শব্দ করে ডাকতে লাগল, 'পাবু পাবু, শোন। প্লীজ—'

পাবু দাঁড়াল না, পেছন ফিরে তাকালও না, সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

নিচে এসে সোজা সে চলে গেল সী সাইড রোডে। ক্রিসমাস ইভের এই রাত্রে আলোয় আলোয় চারদিক ঝলমল করছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না পাবু। তার চোখের সামনে এই ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড যেন ঝাপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন।

লক্ষ্যহীনের মতো হাঁটতে হাঁটতে কখন যে পাবু সী সাইড রোড থেকে নেমে সমুদ্রের কাছে গিয়ে বসেছিল, মনে নেই।

অন্ধকারে আরব সাগরের নিরাকার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কিছুই সে ভাবতে পারছিল না। সেই পুরনো দিনের বিষাদ এবং নিঃসঙ্গতা তাকে আবার চারিদিক থেকে ঘিরে ধরতে শুরু করছিল।

কতক্ষণ একা একা বসে ছিল, পাবু জানে না। হঠাৎ একসময় খুব কাছ থেকে কে ডাকল 'পাবু—'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই পাবু জুলিকে দেখতে পেল। জুলি বলল, 'এই ব্যাণ্ড

স্ট্যাণ্ডে তোমাকে এক ঘন্টা ধরে খুঁজছি ; শেষ পর্যন্ত এখানে পেলাম—'

অত্যন্ত রূঢ় গলায় পাবু বলল, 'কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছিল ?'

করুণ গলায় জুলি বলল, 'পাবু—'

'চলে যাও এখান থেকে, চলে যাও—আমি তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না—'

'পাবু প্লীজ—'

পাবু কর্কশ স্বরে উন্মাদের মতো চিৎকার করতে লাগল, 'ইউ আর নো বেটার দ্যান মাই মাদার। এ প্রস্টিচিউট, বেশ্যা। কেন তুমি আমাকে বিট্রে করলে ?'

'আমার কথা শোন পাবু—'

'তোমার কোন কথাই আমি শুনব না।'

'শুনতে তোমাকে হবেই।' পাবুর ঠিক পাশেই বসে পড়ল জুলি।

পাবু এবার আর কিছু বলল না। মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

জুলি বলতে লাগল, 'তুমি যা বলেছ আমার পরিচয় ঠিক তা-ই। আমি প্রস্টিচিউটই। ওই আদভানী লোকটার আমি মিসট্রেস। শুধু তাই নয়, ওই আদভানীর জন্য আরো অনেক জঘন্য কাজ আমাকে করতে হয়। কেন আমার এই জীবন, অনেকবার তোমাকে বলতে চেয়েছি। কিন্তু পারি নি।'

পাবু চুপ করে রইল।

জুলি এরপর যা বলল, সংক্ষেপে এইরকম। তারা খুব গরীব গোয়ানিজ খৃষ্টান। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে আদভানী তাকে প্রায় কিনেই এই বোম্বেতে নিয়ে এসেছিল। সেই থেকে জুলি তার মিসট্রেস হয়ে আছে। আদভানী লোকটা ব্যবসাদার ; বিজনেসের জন্য উঁচু স্তরের নানা ধরনের মানুষকে তার খুশি করতে হয়। সেই সব মানুষদের এন্টারটেন করতে হয় জুলিকে। এইভাবে আদভানী তাকে দিনের পর দিন একটা অন্ধকার পাতালের দিকে নিয়ে চলেছে। এইরকম ঘৃণিত কুৎসিত জীবন সে চায় না, চায় না। বলতে বলতে জুলি কাঁদতে লাগল।

পাবু খুব উদাসীনভাবে বলল, 'এসব কথা শুনে আমার কী লাভ ? তুমি আমাকে ঠকিয়েছ ; আই হেট ইউ, আই হেট ইউ—'

স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল জুলি। তারপর শানানো ছুরির মতো যেন ঝলসে উঠল, 'ঘৃণা কর, তাই না ? কিন্তু তোমার মা কিংবা আমি যে কত অসহায়, সে কথাটা একবার ভেবে দেখেছ। ভেবে দেখেছ আমরা কিভাবে শয়তানের হাতের শিকার হয়ে গেছি।'

পাবু ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

জুলি থামে নি, শ্বাসরুদ্ধের মতো সমানে বলে যাচ্ছে, 'তুমি না একটা মানুষ! ইউ আর এ ম্যান, আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তোমার মা'র বেলায় যে অন্যায় হয়েছে তার বিরুদ্ধে একবারও রুখে দাঁড়িয়েছ? শুধু ঘৃণা করেই দায়িত্ব এড়াতে চাও? কাপুরুষ, কাওয়ার্ড!' বলেই দুই হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আর পাবু চমকে উঠল, সত্যিই তো, সারা জীবন ধরে কী করেছে সে? যখনই কোন অন্যায় দেখেছে সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে শুধু পালিয়েই গেছে। সে এসকেপিস্ট, প্যাসিভ, জীবনবিমুখ। এতকাল সব কিছু থেকে নিজেকে সে শুধু গুটিয়েই নিয়েছে। কিন্তু সে যে একটা মানুষ, জড় পদার্থ নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তার যে প্রতিবাদ জানানো দরকার, এই কথাটা জুলির মতো কেউ তাকে বুঝিয়ে দেয় নি। পাবুর বাইশ বছরের যৌবন যেন তোলপাড় হয়ে যেতে লাগল। সে ভাবল, আর পালানো নয়, নিজেকে আর গুটিয়ে নেওয়া নয়, এবার থেকে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াবে। এখন তার সামনে অনেক যুদ্ধ।

জুলি ফুঁপিয়েই যাচ্ছিল। তার পিঠে একটা হাত রেখে পাবু ডাকল, 'জুলি—'

জুলি মুখ তুলল; তার দু-চোখ জলে ভরে আছে।

পাবু বলল, 'অনেক রাত হয়েছে, বোধ হয় বড়দিন শুরু হয়েছে। চল, আগে মাউণ্ট মেরিতে যাই, সেখান থেকে ফিরে আদভানীর সঙ্গে বোঝাপড়া করব।'

একটু পর ওরা সী সাইড রোডে এসে পড়ল। সেখান থেকে খাড়া রাস্তাটা ধরে উঠতে উঠতে শুনতে পেল মাউণ্ট মেরি চার্চে ঘণ্টা বাজছে ডিং ডং—ডিং ডং। আরো একটু এগুতে পাবুরা ক্যারল গানের সুর শুনতে পেল। অর্থাৎ বড়দিন শুরু হয়ে গেছে।

দু'জনে বড় বড় পা ফেলে চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে লাগল।

আলোর ময়ূর

সারা গায়ে ভোরের শিশির মেখে ট্রেনটা সাহেবগঞ্জ এসে গেল।

রোদ উঠতে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি। হিমে আর কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা হয়ে আছে। সাঁওতাল পরগণার লম্বা পাহাড়ী রেঞ্জটা দূর দিগন্তে অস্পষ্ট আঁচড়ের মতন মনে হচ্ছে; আকাশের এ-কোণে ও-কোণে দু-চারটে জলজ্বলে তারা চোখে পড়ে।

রেলের টাইম-টেবলে এই ট্রেনটার একটা জমকালো পোশাকী নাম আছে—আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস। আজ খুব ভিড়-টিড় ছিল না। ইঞ্জিনের কাছাকাছি একটা সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে তপতী আর সোমা গা ছড়িয়ে বেশ আরামেই আসতে পেরেছে। কামরাটা এত ফাঁকা, ইচ্ছে করলেই ওরা এক সীটে মাথা, এক সীটে হাত, এক সীটে পা রেখে আসতে পারত।

তপতীর বয়েস চব্বিশ পঁচিশের মতন। গোলগাল আদুরে মুখ; ভরাট গলা; কণ্ঠার হাড় কোমল মাংসের তলায় ঢাকা। মসৃণ ত্বকে যেন কচি পাতার লাবণ্য। বড় বড় চোখে কাচের গুলির মতন উজ্জ্বল মণি। অজস্র চুল উড়ছে; কপালের সবুজ টিপটা লেপটানো; পরনের শাড়িটা দলা মোচড়া হয়ে আছে।

সোমা তপতীর চাইতে দু-এক বছরের বড়ই হবে। মুখের গড়ন পানপাতার মতন। চোখ-নাক সব যেন কাটা-কাটা, নিখুঁত। গায়ের রঙ টকটকে; প্রতিমার মতন বিশাল চোখ। চুলগুলো খোঁপায় আটকানো। তপতীর মতন তার চোখে-মুখে চেহারায় উজ্জ্বলতা নেই। ঝকঝকে আয়নার ওপর ধুলোবালি জমলে যেমন দেখায় সোমাকে ঘিরে তেমনি এক বিষাদ মাখানো রয়েছে। চোখের তলায় কপালে, ঘাড়ে কালচে শ্যাওলার মতন ছোপ। সেটা ট্রেনে রাত কাটাবার জন্য নয়। সোমার দিকে তাকালেই মনে হবে, তার ভেতরে অনবরত এক যুদ্ধ চলছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে টী-ভেণ্ডারদের ঘুমন্ত ভারী গলা ভেসে আসছে, 'চা গ্রাম (গরম), চা—গ্রাম—' কুলিরা চেঁচাচ্ছিল, 'সাহাবগঞ্জ—সাহাবগঞ্জ—' চেঁচাতে চেঁচাতে হুড়মুড় করে কামরায় কামরায় ঢুকে পড়ছিল।

তপতী হাই তুলে আর আঙুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে আলস্য কাটিয়ে নিল। এলোমেলো শাড়িটা ঠিকঠাক করে মুখের ওপর থেকে উড়ন্ত চুলগুলো দু' হাতে সরাতে সরাতে সোমাকে বলল, 'এবার আমাদের নামতে হবে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে নে সোমা।' দু-এক বছরের বড় হওয়াটাকে আমলই দেয় না তপতী ; সোমাকে সে নাম ধরেই ডাকে।

সোমা উঠে পড়ল। জিনিসপত্র আর কি। দুটো হাওয়া-ভর্তি বালিশ, একটা চাদর আর একটা কম্বল হোল্ড অল থেকে বার করে ওরা পেতে নিয়েছিল। সময় কাটাবার জন্য দুটো সস্তা থ্রিলারও স্যুটকেশ থেকে বার করা হয়েছিল।

দ্রুত চাদর-টাদর ভাঁজ করতে লাগল সোমা। তপতী বলল, 'অত তাড়াহুড়ো করতে হবে না ; আস্তে আস্তে গোছা। এখানে দশ মিনিটের স্টপেজ। ইঞ্জিন জল-টল নেবে, তারপর ছাড়বে।'

সোমা উত্তর দিল না। ভাঁজকরা চাদর-কম্বল হোল্ডঅলে পুরে ফেলল। এদিকে হাওয়া-বালিশের হাওয়া বার করে বেতের বাস্কেটে ঢুকিয়ে ফেলেছে তপতী ; বই দুটো চালান করেছে স্যুটকেশের ভেতর। দু'জনের আলাদা আলাদা স্যুটকেশ। কিন্তু হোল্ডল একটাই, বাস্কেটও তাই। ও দুটো ভাগের। সব গোছানো-টোছানো হলে তপতী বলল, 'আপার ইণ্ডিয়া আজ দারুণ এসেছে। দশ বছর এ দিকে যাতায়াত করছি। যতবার এসেছি ততবারই দু-তিন ঘণ্টা লেট। এই প্রথম গাড়িটা রাইট টাইমে এল।'

সোমা বলল, 'তাই নাকি—'

তপতী উৎসাহের গলায় বলতে লাগল, 'আর এসেছিও গ্র্যাণ্ড। অন্য অন্য বার ভিড়ে দম আটকে আসে ; এবার হাত-পা ছড়িয়ে বসতে পেরেছি।'

'শুধু বসেই এসেছিস!' সোমা হাসল, 'ঘুমটা বুঝি বাদ গেল! যা নাক ডাকছিল। কতবার ঠেলেছি, ডেকেছি, তোর সাড়াই নেই।'

তপতীও হেসে ফেলল, 'যা বলেছিস ভাই। ট্রেনে উঠলে আমার ভীষণ ঘুম পায়। তবে নাক ডাকে না।'

'নিজের নাক ডাকা কেউ শুনতে পায়?'

তপতী বলল, 'আমি একলাই ঘুমিয়েছি ; তুই ঘুমোস নি? তুই বুঝি আমার নাক ডাকা শোনবার জন্যে জেগে বসে ছিলি?'

সোমা চুপ করে রইল। তার মনে পড়ল কাল ন'টা দশে শিয়ালদা থেকে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেস ছেড়েছিল। দক্ষিণেশ্বর পেরুবার আগেই তপতী ঢুলতে শুরু করেছিল ; তারপর আরো দু-এক কিলোমিটার যেতে না যেতেই

ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ঘুম ভেঙেছিল সাহেবগঞ্জ আসার খানিকটা আগে। সোমা কিন্তু ঘুমোতে পারে নি। একেকটা স্টেশন এসেছে—বর্ধমান, বোলপুর, সাঁইথিয়া, তিনপাহাড়, রাজমহল, পাকুড়—সোমা শুধু জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ মেলে থেকেছে। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে ঘুমন্ত তপতীকে দেখতে দেখতে এক ধরনের বিচিত্র ঈর্ষা অনুভব করেছে। তপতী কত সুখী, কত দুশ্চিন্তাহীন। আর সোমা নিজে? ক' মাস ধরে সে ইনসমনিয়ার রুগী। জীবনের আশ্চর্য এক জটিলতা তার ঘুম বিশ্রাম সুখ ছিনিয়ে নিয়েছে। দিনের বেলাটা তবু মানুষের ভিড়ে, নানারকম হৈচৈ-তে কেটে যায়। কিন্তু রাত্রিবেলা কলকাতা নামে এক মহানগরের সব শব্দ সব হট্টগোল সব ব্যস্ততা থিতিয়ে থিতিয়ে যখন অতলে নামতে থাকে, পৃথিবী যখন ঘুমের আরকে ডুবে যায় সেই সময় ঘরময় হেঁটে বেড়ায় সোমা। সত্তর লক্ষ মানুষের নিদ্রিত শহরে সে-ই বোধহয় একা, যার চোখে ঘুম নেই।

সোমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করল না তপতী। বলল, 'এত মোট-ঘাট আমরা নামাতে পারব না, দাঁড়া কুলী ডাকি।' কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে একটা কুলী ডেকে আনল সে, বলল, 'সামান উঠাও—'

কুলীটা জিজ্ঞেস করল, 'কিধার যায়েগা মাঈজী?'

'ঘাটগাড়ি।'

কুলীটা সুটকেশ-টুটকেশ চটপট মাথায় তুলে এগিয়ে চলল। তার সঙ্গে যেতে যেতে পেছন ফিরে একবার কামরাটা দেখে নিল তপতী—কিছু পড়ে-টড়ে আছে কিনা। না, কিছু নেই। দু-তিনটি বিহারী ভদ্রলোক জানালার ধারে বসে দাঁতন করছেন। এক বিপুলদেহ মারোয়াড়ী আর তার স্ত্রী—কাল ট্রেনে উঠে এদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, এখনও পাল্লা দিয়ে ঘুমোচ্ছে, জামা কাপড় আলুথালু। বিশ নম্বর কড়াইর মতন তাদের বিরাট পেট নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠা-নামা করছে।

প্ল্যাটফর্মে নামতেই ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া ওদের ওপর লাফিয়ে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে গায়ে কাঁটা দিল। তাড়াতাড়ি শাড়ি দিয়ে গলা হাত-টাত ঢেকে সোমা বলল, 'এখানে তো বেশ শীত রে—'

তপতী মাথা নাড়ল 'হ্যা—'

আজ মার্চের আট তারিখ। এর মধ্যেই কলকাতায় গরম পড়তে শুরু করেছে; ফ্যান ছাড়া রাত্তিরে ঘুমনো যায় না। অথচ কলকাতা থেকে শ' দুই মাইল দূরে এই জায়গাটা প্রাণ ধরে এখনও শীতটাকে বিদায় দিতে পারে নি।

তপতী বলল, 'চারদিকে পাহাড়-টাহাড় আছে কিনা ; তাই ঠাণ্ডাটাও আছে।'

প্ল্যাটফর্মে টিউব লাইটগুলো জ্বলছিল ; কালো কোট পরা রেলবাবুরা চারদিকে ছোটাছুটি করছিল। এধার ওধারে যাত্রীদের ভিড়, কুলীদের জটলা।

গেটে টিকিট জমা দিয়ে ওরা স্টেশনের পিছন দিকে চলে এল। সেখানে লাইনের ওপর আবছা অন্ধকারে লম্বা সরীসৃপের মতন একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। কুলীটা একটা ফাঁকা কামরায় মালপত্র তুলে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

হোল্ডঅল থেকে চাদর বার করে বেঞ্চের ওপর পাততে পাততে তপতী বলল, 'আর মোটে ঘণ্টা আটেক ; তারপরেই বাড়ি পেঁাছে যাব, বুঝলি—'

তপতীকে খুব হাসিখুশি আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। অনেক দিন পর বাড়ি ফিরতে পারলে কার না আনন্দ হয়। সোমা কিছু বলল না।

তপতী আবার বলল, 'এখান থেকে সগরিগলি ঘাট যাব ; সেখান থেকে স্টিমারে মণিহারি ঘাট। মণিহারি ঘাট থেকে ট্রেনে কাটিহার। কাটিহার থেকে ট্যাক্সিতে পূর্ণিয়া।' কব্জী উল্টে ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন ছ'টা ; ঠিক ছুটোয় দেখবি বাড়িতে হাজির হয়েছি।'

সোমা উৎসাহ দেখাল না। নিরুৎসুক গলায় বলল, 'ও তাই নাকি—'

তপতী নিজের খেয়ালে বলে যেতে লাগল, 'স্টীমারে নদী পার হওয়াটা গ্র্যাণ্ড লাগবে। ট্যাক্সিতে কাটিহার থেকে পূর্ণিয়া ট্রিপটাও খুব এনজয় করবি।'

আগের স্বরেই সোমা বলল, 'বেশ তো।'

সারা রাত ঘুম হয় নি। চোখ জ্বালা জ্বালা করছিল সোমার। মাথার ভেতরটা ঝিম ঝিম করছে। ঘাড়ের কাছটায় কেউ যেন হাজারটা পিন ফোটাচ্ছে। ক্লান্ত গলায় সোমা বলল, 'এখানে জল-টল পাওয়া যাবে রে? বাসি মুখটা না ধুতে পারলে বিশ্রী লাগছে।'

'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দাঁড়া আনছি।' বড় বড় দুটো ওয়াটার বটল্ নিয়ে স্টেশনে চলে গেল তপতী ; একটু পরেই ভর্তি করে ফিরে এল।

সোমা মুখ-টুখ ধুয়ে ঘাড়ে-গলায় জল দিল। সাঁওতাল পরগণার হিমেল বাতাস ছিলই। আস্তে আস্তে অসুস্থ স্নায়ু জুড়িয়ে আসতে লাগল তার।

তপতীও মুখ ধুয়ে নিয়েছিল। ধুয়েই সে আবার স্টেশনে ছুটল। এবার ডেকে আনল একটা চা-ওলাকে। চা-ওলা দুজনকে চা দিয়ে চলে গেল।

তপতী বলল, 'এখানকার চা যাচ্ছেতাই ; গরম জলই বলতে পারিস। কি আর করবি, এ-ই খা, কাটিহার গিয়ে ভাল চা খাওয়াব।'

নিঃশব্দে ভাঁড়ে চুমুক দিল সোমা। চা-টা যেমনই হোক ; খাবার পর মাথার

ঝিমঝিম ভাবটা কমে আসতে লাগল।

দেখতে দেখতে চারদিক ফর্সা হয়ে গেল। একটু আগে আবছা মতন যে অন্ধকার আকাশ এবং পাহাড়-টাহাড়ের গায়ে জড়াজড়ি করে ছিল, কেউ যেন লাটাইতে সুতো গুটোনোর মতন একটানে সেটা তুলে নিয়ে গেল। অন্ধকারটা নেই, তবে সিল্কের মতন সাদা কুয়াশা সাঁওতাল পরগণার দীর্ঘ রেঞ্জটার মাথায় আটকে আছে। সূর্যটা উঁকি ঝুঁকি দিতে দিতে ঝপ করে দিগন্তের তলা থেকে উঠে এল। মার্চের এই সকালে ঝাঁক ঝাঁক পাখি বেরিয়ে পড়েছে। সারা গায়ে ভোরের আলো মেখে তারা পাক খেয়ে খেয়ে উড়ছিল।

পাহাড়ের রেঞ্জটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে তপতী বলল, 'ছাখ, ছাখ সোমা, কি ফাইন, না?'

সাঁওতাল পরগণার ওই পাহাড় আকাশের কোল ঘেঁষে চলেছে তো চলেইছে। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে, হয়তো দেশ থেকে দেশান্তরে। এদিকে আর কখনও আসে নি সোমা। এখানকার এই সকালবেলাটা নিজের অজান্তে কখন যেন তাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। পাহাড় দেখতে দেখতে সে আধফোটা গলায় বলল, 'সত্যি ফাইন রে—'

'সেই ছেলেবেলা থেকে এই পাহাড়ের রেঞ্জটা দেখছি। কতবার দেখেছি! তবু এখনও ভাল লাগে।'

'ওখানে লোকজন থাকে?'

'সাঁওতাল-টাওতালরা থাকে। ওদের জন্যেই তো সাঁওতাল পরগণা নাম হয়েছে।'

সোমা মনে মনে ভাবল, ঠিক তো। জায়গাটার নাম শুনেই সাঁওতালদের কথা তার মনে পড়া উচিত ছিল। বলল, 'তুই কখনও ওদিকে গেছিস?'

'না ভাই,' তপতী বলতে লাগল, 'এই সাহেবগঞ্জ থেকে যতটুকু দেখা যায় ব্যস, ওই পর্যন্ত—'

সোমা আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

তপতী এদিক সেদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ঐ ছাখ ছাখ, কি লাভলি সূর্যটা—'

সোমা সেদিকে তাকাল। সব ব্যাপারেই তপতীর উচ্ছ্বাস একটু বেশি। তবু সূর্যোদয়টাকে ভালই লাগল; সোনার থালার মতন সেটা দাঁড়িয়ে আছে।

আরো কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ঘাটগাড়িটা বোঝাই হয়ে গেছে।

এত লোক কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, কে জানে। কোত্থেকে একটা

ইঞ্জিন এসে ঘাটগাড়িটার গায়ে লেগে গেল। তারপর গার্ডের হুইস্‌ল বাজল, ফ্ল্যাগ নড়ল, ভাঙা গলায় একবার চেঁচিয়ে উঠে ঘাটগাড়ি হেলে দুলে চলতে শুরু করল।

মিনিট পনের যাবার পর সোমার চোখে পড়ল, দূরে সাদা কাগজের মতন একটা নদী পড়ে আছে। তপতী প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'নদীটা দেখেছিস সোমা?'

অনুচ্চ মৃদু স্বরে সোমা বলল, 'হ্যাঁ—'

'কি নাইস!'

সোমা উত্তর দিল না; পলকহীন নদীটাকে দেখতে লাগল।

তপতী আবার বলল, 'ঐ নদীটা আমাদের পেরুতে হবে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা সগারিগলি ঘাটে এসে গেল। ঘাটগাড়িটা সাহেবগঞ্জ থেকে যাদের তুলে এনেছিল, হুড়মুড় করে দরজা খুলে তারা বেরিয়ে পড়ল।

স্টেশনটা ভারি মজার। তার একধারে বিশাল মাঠ; আরেক ধারে দু'পা বালির ডাঙা ভাঙলেই স্টীমার ঘাট। জেটিতে একটা স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। তার মাস্তুলে একটা শঙ্খচিল ডানা মুড়ে বসে আছে

একটা কুলী ডেকে মালপত্র তার মাথায় চাপিয়ে ধীরে সুস্থে সোমারা নামল। স্টীমারটার দিকে যেতে যেতে তপতী বলল, 'ঘাট অনেকটা এগিয়ে এসেছে। নইলে আরো সময় লাগত'।

সোমা বলল, 'ঘাট এগিয়ে এসেছে; সে আবার কী! পিছিয়েও যায় নাকি?'

'হ্যাঁ। এই তো পুজোর পর যখন এলাম তখন ঘাটটা ছিল দু মাইল দূরে।'

'এ রকম কেন হয়?'

'নদী পাড় ভাঙছে, তাই ঘাটটা কখনও এগোয়, কখনও পিছোয়।'

গল্প করতে করতে ওরা স্টীমারে এসে উঠল। ডেকের একধারে চাদর বিছিয়ে বসতে বসতে সোমা জিজ্ঞেস করল, 'নদীটা পেরুতে কতক্ষণ লাগবে?'

তপতী বলল, 'ঘণ্টাখানেক তো নিশ্চয়ই।'

সূর্যটা আরো অনেকখানি উঠে এসেছে। নদীর শান্ত স্থির জলে এখন রোদের ছড়াছড়ি। বাতাসে হিমের ভাবটা কেটে এসেছে। তবু বেশ শীত শীত করছে। ঝাঁকে ঝাঁকে বক নদীর জলে ছোঁ দিয়ে পড়ছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে লম্বা ঠোঁটে একেকটা শিকার গেঁথে উঠে আসছিল।

একসময় স্টীমার ছেড়ে দিল। ধীরে ধীরে নদীর এপারটা দূরে সরে যেতে লাগল। দূরে সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ী রেঞ্জটা আবছা হয়ে যাচ্ছে।

এদিকে আগে আর কখনও আসে নি সোমা। সাঁওতাল পরগণা তো অনেক

দূরের রাস্তা, কলকাতার পুব দিকেই এই তার প্রথম আসা। কালই প্রথম সে শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকেছে। শিয়ালদার পর থেকে যা কিছু, এতদিন সবই ছিল তার অচেনা, বইয়ে-পড়া কোন রহস্যময় মহাদেশের মতন।

শিয়ালদা আসার দরকারই হয় না সোমার। ঠাকুরদার আমল থেকেই ওরা ইউ. পি-তে ডোমিসাইল্ড। ঠাকুরদা তাঁর যৌবনে চাকরি নিয়ে লক্ষ্ণৌ গিয়েছিলেন; সেই থেকে বাঙলাদেশের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ একরকম নেই বললেই হয়। ঠাকুরদা অবশ্য সারাজীবন ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে গেছেন; বাবা কিন্তু উত্তর প্রদেশকেই স্বদেশ বলে জানেন। চাকরিতে থাকতে থাকতেই, এই তো সেদিন জায়গা-টায়গা কিনে লক্ষ্ণৌতে বাড়ি করলেন। মা অবশ্য মৃদু আপত্তি করেছিলেন; তাঁর মতে বাড়ি-টাড়ি দেশে গিয়েই করা উচিত। দেশ বলতে বাঙলাদেশ। বাবা বলেছিলেন, এতদিন পর দেশে ফেরার মানে হয় না। বাঙলাদেশটা তাঁর মাতৃভূমি; এই পর্যন্ত। কিন্তু তার কতটুকুই বা তিনি চেনেন। সেখানকার গাছপালা, পশুপাখি, মানুষজন—সবই তাঁর অজানা। এ বয়েসে বাঙলাদেশে ফিরলে অচেনা বিদেশীর মতন থাকতে হবে।

বছর তিনেক হল বাবা রিটায়ার করেছেন; এখন লক্ষ্ণৌতে তাঁর শান্ত অবসরের জীবন। দুই দাদা ওখানেই স্টেট গভর্ণমেণ্টে বিরাট চাকরি করে, মোটা মাইনে। একমাত্র দিদির বিয়ে হয়েছে কানপুরে; জামাইবাবু অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির অফিসার। তাদের সংসার মোটামুটি সুখের।

ভাইবোনদের মধ্যে সোমাই ছোট। ছোট বলেই কিনা কে জানে, কিছুটা জেদী, এবং একগুঁয়ে। লক্ষ্ণৌ থেকে বি-এ পাশ করার পর হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলল কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে এম-এ পড়বে। দাদারা বাধা দিয়েছিল। কলকাতায় আগে আর কখনও আসে নি সোমা। এই অচেনা শহরে কোথায় গিয়ে থাকবে সোমা, কোন বিপদ-টিপদ হবে কিনা, এই সব ভেবেই দাদাদের আপত্তি। বড়দা বলেছিল, বি-এ পর্যন্ত যখন এখানে পড়েছিস, এম-এটাও পড়ে ফেল। ছোটদা তার চাইতে মোটে দু বছরের বড়, দু'জনের সম্পর্কটা নিয়ত যুদ্ধের। একজন আরেকজনের পেছনে দিনরাত লেগেই আছে। অবশ্য এই লাগালাগিটা পরস্পরের প্রতি টানেরই ছদ্মবেশ। ছোটদা বলেছিল, 'পড়িয়ে-টড়িয়ে আর দরকার নেই। বিয়ে দিয়ে ওটাকে পার করে দেওয়াই ভাল।' তক্ষুণি দু'জনের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাবা তাদের থামিয়ে বলেছিলেন, 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির সে গ্ল্যামার আর নেই; তুই বাপু এখানেই পড়।' কিন্তু সোমা ঘাড় বাঁকিয়েই রেখেছিল; কলকাতায় সে পড়বেই।

শেষ পর্যন্ত সোমার জেদেরই জয় হয়েছিল। বাবা নিজে এসে তাকে কলকাতায় ভর্তি করে হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিলেন। আর ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়তে পড়তেই বিকাশের সঙ্গে তার আলাপ। সেই আলাপের দিনটা থেকেই জীবনের এক আশ্চর্য জটিলতার ভেতর পা দিয়েছিল সোমা।

হঠাৎ কানের পাশ থেকে তপতী ডাকল, 'সোমা—ঐ চরটা দেখছিস—।'

সোমা চমকে উঠল। স্টীমার এখন মাঝ-নদীতে; প্রকাণ্ড এক চরের পাশ দিয়ে ওরা যাচ্ছিল। সোমা সেদিকে তাকাল।

তপতী বলল, 'চরটা ফার্স্ট ক্লাস, না?'

সেই সাহেবগঞ্জে নামবার পর থেকে কত কি দেখাচ্ছে তপতী। বায়োস্কোপের বাক্সে চোখ লাগাবার পর বায়োস্কোপওলা যেমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'আগ্রাকা তাজমহল দেখো, কুতুব মিনার দেখো, হাওড়া ব্রিজ দেখো, বম্বাইকা সড়ক দেখো—' তেমনি তপতী ক্রমাগত বলে যাচ্ছে, 'সাঁওতাল পরগণার পাহাড় ভ্যাখ, নদী ভ্যাখ, আকাশ ভ্যাখ, নদীর চর ভ্যাখ—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

সোমা বলল, 'হ্যাঁ, চরটা সত্যি সুন্দর রে—'

'দিন দিন এটা বড় হচ্ছে। দশ বছর আগে কতটুকু ছিল; আমার মনে হয় চরটা বড় হয়ে হয়ে একদিন নদীটাকে বুজিয়ে ফেলবে।'

সোমা চুপ। তপতী আবার বলল, 'আমার অনেক দিনের একটা ইচ্ছা আছে।'

'কী?'

'ওই চরটায় একটা ঘর তুলে কিছুদিন থাকব। চমৎকার লাগবে, না কি বলিস? নির্জন চরে, হু-হু বাতাসে, চাঁদের আলোয় যা একখানা ব্যাপার হবে না? তুই থাকবি আমার সঙ্গে?'

সোমা হেসে ফেলল, 'আমাকে কেন, তোকে সঙ্গ দেবার লোক তো রেডি হয়েই আছে। বিয়ের পর হনিমুনটা এই চরেই করিস।'

তপতীর বিয়ে একরকম ঠিক হয়েই আছে। ছেলেটি আমেরিকার এক ইউনিভার্সিটিতে রীসার্চ স্কলার; মাস ছয়েকের ভেতর মেট্যালার্জিতে থীসিস সাবমিট করার কথা তার। ডক্টরেটটা পেয়ে গেলেই দেশে ফিরে বিয়েটা সেরে ফেলবে। ভাল চাকরি-বাকরি পেলে ইণ্ডিয়ায় থেকে যাবে, নইলে বউ নিয়ে আবার আমেরিকায় পাড়ি।

হনিমুনের কথায় মুখ লাল হয়ে উঠল তপতীর। একটুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। তারপর ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে চোখের কোণে তাকিয়ে বলল, 'হনিমুনের সময় তোকেও নিয়ে আসব।'

অনেক অনেকদিন পর প্রগল্‌ভতার ঈশ্বর যেন সোমার কাঁধে ভর করল। সকালবেলার আকাশ, নদী, টলটলে রোদ, সাঁওতাল পরগণার জাদুকর পাহাড়, সব একাকার হয়ে পাষাণভারের মতন তার সেই বিষাদটা ভুলিয়ে দিতে লাগল। তপতী গলায় তর্জনীর আলতো ঠেলায় সে বলল, 'দুজনেই মজা; তার মধ্যে আরেকজন ঢুকলেই গোলমাল। জানিস, আমাদের লক্ষ্ণৌতে একটা প্রবাদ আছে।'

'কী?'

'কাবাবমে হাড্ডি। শুধু শুধু আমাকে জুটিয়ে কেন কাবাবে হাড় ঢোকাতে চাইছিস ভাই?'

'দারুণ বলেছিস সোমা—' শব্দ করে হেসে উঠল তপতী।

স্টীমারটা প্রকাণ্ড চাকায় জল কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল। নদীর ওপারটা দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে। ডেকের ওপর যাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ছিল; কেউ কেউ রেলিঙে ভর দিয়ে জলের ওপর ঝুঁকে আছে। বেশির ভাগই স্থানীয় দেহাতী মানুষ, কিছু কিছু আদিবাসী সাঁওতালও চোখে পড়ছে। চোখে গগল্‌স, পরনে চাপা প্যাণ্ট, কাঁধে ক্যামেরা, হাতে ট্রানজিস্টর—দু-চারটে ছোকরাও ডেকের এ-মাথায় সে-মাথায় ঘোরাঘুরি করছে।

ঘোলা জলের দিকে তাকিয়ে সোমা বলল, 'আজ ক'তারিখ রে?'

'আট, কেন?'

'ফোরটিন্‌থ্‌ কিন্তু পূর্ণিয়া থেকে ফিরে আসব।'

'আরে বাবা এখনও পূর্ণিয়ায় পৌঁছুলিই না। আগে চল্‌, দু-চার-দিন থাক, তারপর তো ফেরার কথা।'

'না ভাই, ফোরটিন্‌থ্‌ ফিরতেই হবে। সেই কথা বলেই তুই এনেছিস। পরে ঝঞ্ঝাট করবি না কিন্তু—'

'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে।' তপতী ব্যাপারটাকে আমলই দিল না।

সোমা বলল, 'দেখা যাবে বললে চলবে না। যদি আটকাতে চাস, এখনই বলে ফ্যাল। আমি এখান থেকেই ফিরে যাই।'

'কলকাতায় এখন তোর কোন্‌ রাজকার্য যে ফোরটিন্‌থ্‌ না ফিরলেই নয়? ক' মাসের ছুটি তো পড়ে পড়ে পচছে। আমাদের বাড়ি ক'দিন বেশি থাকলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'সে তুই বুঝবি না।'

রাগ এবং অভিমানের গলায় তপতী বলল, 'বেশ বাবা, চোদ্দ তারিখেই আসিস। হল তো? ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে কত জায়গায় যাব; কত কি দেখাব—'

সোমা উত্তর দিল না।

একটু পর স্টীমারটা মণিহারিঘাট পৌঁছে গেল।

খুব ভিড়-টিড় ছিল না; তাই হুড়োহুড়ি ছোটাছুটিও নেই। ধীরে ধীরে যাত্রীরা নেমে যাচ্ছে। রিস্টওয়াচ দেখে তপতী বলল, 'সাড়ে ন'টা বাজে। আরেকটু কষ্ট করতে হবে; তারপরেই বাড়ি।'

সোমা হাসল, 'আরেকটু কেন, অনেকখানি কষ্ট করতে হলেও রাজী। একবার যখন কলকাতা থেকে বেরিয়েছি, তোদের বাড়ি না গিয়ে ছাড়ছি না।'

কুলি ডেকে মালপত্তর তার জিম্মায় দিয়ে ওরা উঠে পড়ল। কাঠের গ্যাংওয়ে পেরিয়ে পাড়ে উঠেই থমকে গেল তপতী। স্টীমার-ঘাট থেকে ওপরে উঠলেই রেল লাইন; লাইনের কাছে মৃন্ময় দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা উদ্বিগ্ন, কিছুটা চিন্তিত, তার চোখ স্টীমারের দিকে। কাউকে খুঁজছে হয়তো।

ঝকঝকে স্মার্ট চেহারা মৃন্ময়ের। বয়স পঁয়ত্রিশের মতন। গায়ের রঙ কালোও না, আবার ফর্সাও না। দুয়ের মাঝামাঝি। নাক-মুখ-টুখ, আলাদা আলাদাভাবে দেখলে হয়তো হাজার গণ্ডা খুঁত বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু সব মিলিয়ে ভারি আকর্ষণীয়। পরনে ঢোলা পাজামা আর খদ্দরের ধবধবে পাঞ্জাবি; পাঞ্জাবির হাতা কনুই পর্যন্ত গুটনো; হাতে দামী ঘড়ি; চোখে গগল্‌স্।

মৃন্ময়কে এই মণিহারিঘাটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল। কিছুক্ষণ অবাক থেকে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল তপতী, 'মৃন্ময়দা—'

মৃন্ময় চমকে উঠল। তারপর চোখ থেকে গগল্‌সটা খুলে হাসি-মুখে এগিয়ে এল, 'আরে, তপী—'

মৃন্ময়ের কথা শেষ হবার আগেই তপতী বলল, 'তুমি এখানে কী করছ?'

'তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।'

'আমার জন্যে?'

'ইয়েস ম্যাডাম। ভেবেছিলাম তোকে একটা সারপ্রাইজ দেব।'

'কিন্তু এখন তুমি এখানে এলে কি করে? কাল বিকেলে কাটিহার থেকে লাস্ট ট্রেন এখানে এসেছে। তারপর তো আর কোন ট্রেন ছিল না।'

'কাল বিকেলের ট্রেনটাই ধরেছিলাম। মাঝখানে মণিহারিতে নেমে রাতটা

এক বেহারী বন্ধুর বাড়ি কাটিয়েছি। আজ সকালে সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে ঘাটে চলে এলাম।' মৃন্ময় হাসতে লাগল।

তপতী বলল, 'তোমার মাথায় ছিট-টিট আছে।'

'যা বলেছিস।' বলেই মৃন্ময় ব্যস্ত হয়ে পড়ল, 'হ্যা রে তপী' মাসিমার কাছে শুনেছি, তোর কে এক বন্ধু আসবে। তাকে দেখছি না তো—'

মৃন্ময়ের সঙ্গে তপতীকে কথা বলতে দেখে সোমা কুলিটাকে নিয়ে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তপতী তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল, 'এই যে আমার বন্ধু—সোমা চট্টোপাধ্যায়।' তারপর সোমাকে বলল, 'আর ইনি আমার পূজ্যপাদ মাসতুতো ভাই শ্রীমান মৃন্ময় মিত্র, দিল্লীর একটা ফার্মে কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। আমার চাইতে পাক্কা তিন বছরের ছোট। তবে দাদা শুনবার খুব শখ কিনা, তাই মৃন্ময়দা বলি।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে।' মৃন্ময় চড় তুলল; তপতী চট করে মাথাটা সরিয়ে খুব হাসতে লাগল। মৃন্ময়ও হেসে ফেলল; তারপর সোমার দিকে ফিরে বলল, 'আপনার এই বন্ধুটি মহা ধনুর্ধর।'

মুখ নিচু করে সোমা হাসল।

মৃন্ময় আবার বলল, 'তপতীর মতন আপনিও কলেজে পড়ান নাকি?'

'হ্যা'—আস্তে করে মাথা নাড়ল সোমা।

'আপনার কী সাবজেক্ট?'

'হিস্ট্রী—'

'বেশ পণ্ডিত লোক দেখছি—'

মৃদু স্বরে সোমা বলল, 'কলেজে পড়ালেই পণ্ডিত হয়ে যায় নাকি?'

মৃন্ময় বলল, 'অত শত জানি না। তবে প্রফেসার-টফেসার দেখলে আমার ভীষণ ভক্তি হয়। ইচ্ছে করে পায়ের ধুলো নিই। মাঝে মাঝে তপীর পায়ের ধুলোও নিয়ে থাকি।'

ওধার থেকে তপতী ভেংচে উঠল, 'এ-হে-হে-হে—'

বিব্রতভাবে সোমা বলল, 'কি যে বলেন—'

সোমার কথা যেন শুনতেই পেল না মৃন্ময়। দ্রুত চারদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে খুব নিচু গলায় বলল, 'ব্যাপারটা কী জানেন?'

'কী?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে মৃন্ময় বলল, 'এই যে মহাপুরুষটিকে দেখছেন ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোতে এঁর সাত বছর লেগেছিল। তারপর আর কলেজে

যেতে সাহস হয়নি। তাই কেউ এম-এ পাশ করে প্রফেসারি করছে শুনলে মনে হয় তার গোলাম হয়ে থাকি।'

ভদ্রলোক ঠাট্টা করছে কিনা সোমা বুঝতে পারল না। সে চুপ করে রইল।

এদিকে লটবহর মাথায় কুলিটা দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, 'আউর কিতনা টিম (টাইম) খাড়া রহেগা—'

তপতী তাড়া লাগাল, 'চল চল, সব কথা এখনই ফুরিয়ে ফেললে পরে বলবে কী?' বলে চোখ টিপল।

মৃন্ময় লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চল—'

ওপারের মতন মণিহারিঘাটেও মাঠের মাঝখানে রেলস্টেশন। স্টেশন আর কি, অস্থায়ী ক'টা চালাঘর। তারপর দরমা আর টিনের ছাউনিতে কিছু দোকানপাট—চায়ের দোকান, পানবিড়ির দোকান, সস্তা খাবার-দাবারের দোকান এবং ক'টা ছোটখাটো হোটেল। সেখানে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল।

মৃন্ময় একটা কামরায় গিয়ে উঠল। তারপর সুটকেশ-টুটকেশ গুছিয়ে অঢেল জায়গা নিয়ে সবাই বসল। পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরাল মৃন্ময়। লম্বা একটা টান নিয়ে ফুক ফুক করে ধোঁয়ার আংটি ছাড়তে লাগল।

হঠাৎ কি মনে পড়তে তপতী মৃন্ময়কে বলল, 'ওই দেখ, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করতে একেবারে ভুলে গিয়েছি। তুমি দিল্লী থেকে কবে পূর্ণিয়ায় এসেছ?'

'পরশু। তোর মা জরুরী তলব পাঠিয়েছে যে—'

'কী ব্যাপার?'

দুই হাত চিত করে কাঁধ ঝাঁকাল মৃন্ময়, 'কি জানি, এখনও ফুলমাসি (তপতীর মা) কিছু বলে নি। ঝুলি থেকে বেড়াল-টেড়াল একটা কিছু বেরুবেই। তার জন্য অপেক্ষা করছি।'

একটু ভেবে তপতী বলল, 'এবার কিন্তু অনেক দিন পর পূর্ণিয়ায় এসেছ।'

'হ্যাঁ',—মনে মনে হিসাব করে মৃন্ময় বলল, 'দেড় বছর পর এলাম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মৃন্ময়ের কি যেন মনে পড়ে গেল, 'হ্যাঁ রে তপী, সাহেবগঞ্জে তোরা কখন পৌছেছিস?'

'ভোরবেলা—'

'কিছু খেয়েছিস?'

'এক ভাঁড় করে চা শুধু—'

'সে কি রে—' মৃন্ময় উঠে পড়ল, 'বাড়ি যেতে দুটো আড়াইটে হয়ে যাবে। ততক্ষণ না খেয়ে কি থাকা যায়; সঙ্গে একজন গেস্ট আছেন।'

বিব্রত মুখে সোমা তাড়াতাড়ি বলে, 'আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না—'

'তাই কখনো হয়।' মৃন্ময় বলল, 'এখানে হোটেল রয়েছে। চল, চট করে তিনজনে খেয়ে আসি। ট্রেন ছাড়তে এখনও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে।'

শক খাবার মতন চেঁচিয়ে উঠল তপতী, 'ওরে বাবা রক্ষা কর।'

'কি হল রে।' মৃন্ময় অবাক।

'ঐ সব হোটেলে আমি খেতে-টেতে পারব না। মাটিতে বসে খাওয়া, তার ওপর ভাত-তরকারিতে কিচকিচে বালি, রাঁধুনে ঠাকুর-টাকুরগুলো জন্মে কাপড় চোপড় কাচে না, বড় বড় নখ আর ফাটা ফাটা হাতের ভেতর ময়লা—ন্যাস্টি।' তপতীর নাক-মুখ কুঁচকে যেতে লাগল।

'তোর তো আবার পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় খাবার অভ্যাস কিন্তু মণিহারি ঘাটের এই বেলেমাটির চড়ায় কলকাতার পার্ক স্ট্রীট কোথায় পাই? তুই ট্রেনেই বসে থাক, আমি সোমা দেবীকে খাইয়ে আনি।'

'আমার চাইতে সোমা অনেক বেশি খুঁতখুঁতে। মেরে ফেললেও ওকে তুমি ঐ হোটেলে ঢোকাতে পারবে না।'

'তাহলে আর কি করব।' মৃন্ময়কে হতাশ দেখাল। পরক্ষণেই কি ভেবে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠল সে, 'এক কাজ করি বরং—'

তপতী বলল, 'কী?'

'ট্রেনের টাইমে এখানে সিঙাড়া নিমকি ভাজে। গরম গরম ক'টা নিয়ে আসি।'

'তুমি ক্ষেপেছ মৃন্ময়দা—পচা তেল ফেল দিয়ে ভাজে ওই সব। খেলে আর দেখতে হবে না, হাতে হাতে একখানা গ্যাসট্রিক আলসার—'

ভুরু কুঁচকে ধমকে উঠল মৃন্ময়, 'অত খুঁতখুঁতুনি কিসের রে? এই বয়সে যা পাবি তা-ই খাবি, চব্বিশ বছর না পেরুতেই বুড়ো বুড়ীদের মতন কথাবার্তা।

মৃন্ময় গাড়ি থেকে নেমে গুচ্ছের নিমকি-টিমকি নিয়ে এল।

কিছুক্ষণ নাকের ভেতর খুঁতখুঁত আওয়াজ করে নিতান্ত অনিচ্ছায় একটা সিঙাড়া তুলে নিল তপতী, সোমা নিল একটা নিমকি।

মৃন্ময় সোমাকে বলল, 'আর দু-একটা নিন—'

সোমা বলল, 'না না, আর লাগবে না।'

'তপীর হাওয়া আপনারও গায়ে লেগেছে দেখছি।' আর সাধা-সাধি না করে বাকি নিমকি-টিমকিগুলো চোখের পলকে শেষ করে ফেলল মৃন্ময়।

সাড়ে দশটায় ট্রেন ছাড়ল। ওরা তিনজনেই জানালার ধারে বসেছিল। বাইরে আদিগন্ত সবুজ মাঠ। ঝোপঝাড়, গাছপালা, মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো রবিফসলের ক্ষেত। রুপোলি ঝলকের মতন হঠাৎ একেকটা নদী কিংবা খাল দেখা দিয়েই অদৃশ্য হচ্ছে। কোথাও মোষের পাল চলেছে ; তাদের পিঠে ছোট্ট দেহাতী ছেলে অবাক বিস্ময়ে ট্রেন দেখছে। অনেক উঁচুতে পালিশ করা আয়নার মতন নীলাকাশ। ট্রেন বাঁক নেওয়াতে সাঁওতাল পরগণার রেঞ্জটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

তপতী বলল, 'কি বিউটিফুল মাঠ দেখছিস সোমা!'

সোমার ভাল লাগছিল, আকাশ মাঠ দেখতে দেখতে মাথা নাড়ল সে।

ওধার থেকে মৃন্ময় বলে উঠল, 'মনেই হয় না আমরা বিহারে আছি ; একজ্যাক্ট বাঙলাদেশ যেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'তপীটা গান জানে না ; আপনি জানেন, সোমা দেবী?'

সোমা বলল, 'না।'

'সত্যিই কিছু জানেন না? বাথরুম সং-টংও কোন দিন করেন নি?'

'না।'

'আপনি একটা বোগাস।'

সোমার মুখ-টুখ লাল হয়ে উঠল ; মাথার ভেতরটা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। মৃন্ময়ের সঙ্গে ভাল করে আলাপই হয় নি। সে যে দুম করে এরকম একটা কথা বলতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল। রাগ, অপমান—সব মিলিয়ে যেন কেমন হয়ে গেল সোমা। ভারি ইতর তো লোকটা!

সোমার দিকে তাকালও না মৃন্ময়। হঠাৎ-উচ্ছ্বাসে মোটা বেসুরো গলায় গেয়ে উঠল :

> আমার সোনার বাঙলা,
> আমি তোমায় ভালবাসি
> চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
> আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি!
> ও মা ফাল্গুনে তোর—

তাপতী দু' কানে হাত চাপা দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'থাম থাম ; বেচারী রবীন্দ্রনাথকে অন্তত রেহাই দাও—'

মৃন্ময় গান থামিয়ে কাচুমাচু মুখে বলল, 'কেন রে- গানটা ভাল লাগছে না?'

'গানটা খারাপ কে বলেছে? বাংলা ভাষায় এরকম গান আর ক'টা লেখা

হয়েছে! তবে—'

'বুঝেছি আমার গলাটা রাবিশ, এই তো?' বলেই সোমার দিকে তাকাল, 'জানেন মিস চ্যাটার্জি, গলায় আমার একদম কনট্রোল নেই। হাঁ করলে একসঙ্গে আঠার রকমের আওয়াজ বেরিয়ে আসে। সবই জানি, তবু আবেগ উথলে উঠলে নিজেকে আর সামলাতে পারি না।' বলতে বলতে হেসে ফেলল মৃন্ময়।

সোমা তাকিয়েই ছিল। এমন সরল নিষ্পাপ ছেলেমানুষির হাসি সে খুব বেশি দেখে নি। আশ্চর্য, একটু আগে মৃন্ময়কে মনে হয়েছিল ইতর।

তপতী হঠাৎ বলল, 'ও গানটা তোমার গাওয়া উচিত না মৃন্ময়দা—'

মৃন্ময় অবাক, 'কেন রে?'

'তুমি বিহারে বর্ণ অ্যাণ্ড ব্রট-আপ। বাংলা দেশ নিয়ে মাতামাতি করার রাইট নেই তোমার। তোমার গাওয়া উচিত, আমার সোনার বিহার, আমি তোমায় ভালবাসি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মৃন্ময়। তারপর গাঢ় গলায় বলল, 'যেখানেই জন্মাই আর যেখানেই থাকি, এই বুকের ভেতরটায় যা আছে তার নাম বাংলা দেশ।'

চোখ বড় বড় করে কৌতুকের গলায় তপতী বলল, 'এ যে দেখছি রামভক্ত হনুমানের মতন; বুক চিরে বাংলা দেশ দেখাবে নাকি?'

'ইচ্ছে করলে তা পারি রে—'

মাঠের মাঝখানে একেকটা স্টেশন আসে। কিছু দেহাতী লোক মালপত্র ঝাকা-টাকা নিয়ে হুড়মুড় করে ওঠে, কিছু নামে। তারপরই ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠে ট্রেনটা ছুটতে থাকে।

একটা স্টেশন থেকে এক গাইয়ে ছোকরা উঠল। তের-চোদ্দর মতন বয়েস, ঝাঁকড়া চুল ধুলো-বালিতে জট পাকিয়ে আছে। পরনের ইজেরটা তেল-ময়লায় চিটচিটে, খালি গা। দু' হাতে দু' টুকরো কাঠ। সেদুটো বাজিয়ে মিষ্টি গলায় সে গেয়ে উঠল, 'পাত্‌লী কোমরি হায়, তিরছি নজরী হায়—'

মৃন্ময় কষে ধমক লাগাল, 'থাম ব্যাটা—'

ছেলেটা ভয় পেয়ে গেল, 'জী—'

'পন্দর সাল আগের মাল এখনও চালিয়ে যাচ্ছ ব্যাটা! নয়া গানা লাগা।'

'নয়া গানামে জ্যাদা পাইসা লাগেগা বাবুজী—'

চোখ গোল করে মৃন্ময় বলল, 'ও বাবা, এ যে দেখছি কড়া জিনিস। ঠিক হায়, জ্যাদা পাইসাই পাবি।'

'বহুত খুব—' বলেই গলা চড়িয়ে গান ধরল, 'রূপ তেরা মস্তানা, পেয়ার মেরে দিওয়ানা—' সেই সঙ্গে কাঠের টুকরোর বাজনা—টক্—টক্—টররে—টক্—

'বহুত আচ্ছা বহুত আচ্ছা—' মাথা নেড়ে নেড়ে তাল দিতে লাগল মৃন্ময়।

গান চলছিলই। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে মৃন্ময় বলল, 'এ ছোকরে, গানাকা সাথ নাচা ভি তো লাগাও—'

গান থামিয়ে ছেলেটা বলল, 'জী—'

'আরে বাবা, নাচা-গানা একসাথ।' ছেলেটাকে উৎসাহ দেবার জন্য তুড়ি দিয়ে দিয়ে মৃন্ময় কাঁধ নাচাতে লাগল।

ছেলেটা এবার বুঝতে পারল। বলল, 'কোন্ সা নাচা সাহাব?'

'টুইস্ট জানিস?'

'জী,—রাজেশ খান্নাকা তরা?'

'রাজেশ খান্নাকেও জানিস নাকি!'

'জরুর, উও তো বঢ়িয়া বাহাদুর—'

'লাগা তাহলে রাজেশ খান্নার মতন—'

ছেলেটা পা কাঁপিয়ে গানের সঙ্গে নাচও জুড়ে দিল। ঘাড় কাত করে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল মৃন্ময়; তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ধুর—টুইস্ট-ফুইস্ট তুই কিছু জানিস না। আমার কাছে শিখে নে।' কোমর এবং হাঁটু কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে এক পাক নেচে দেখিয়ে দিল মৃন্ময়।

সোমা অবাক চোখে মৃন্ময়কে দেখছিল। কিছুক্ষণ আগে এই মানুষটাকে সরল নিষ্পাপ বালকের মতন মনে হয়েছিল। আর এখন? মনে হচ্ছে তপতীর এই মাসতুতো ভাইটা ক্লাউন ছাড়া আর কিছু না। কোন ভদ্র রুচির মানুষ যে এভাবে নাচতে পারে, সোমা কল্পনাই করতে পারে না। বিরক্তি রাগ আর অস্বস্তিতে তার চোখমুখ কুঁচকে যেতে লাগল।

গাইয়ে ছোকরাটা আবার নতুন করে শুরু করল। কিন্তু কিছুতেই আর মৃন্ময়ের পছন্দমত হচ্ছে না; বার বার শুধরে দিতে লাগল মৃন্ময়।

তপতী মৃন্ময়ের কাণ্ড দেখে খুব হাসছিল। হাসতে হাসতেই সোমার কাঁধে আঙুলের খোঁচা দিয়ে বলল, 'ত্যাখ্ মৃন্ময়দাটা একেবারে যাচ্ছেতাই—'

ঐ রকম একটা বাজে লোকের কুরুচিকর কোমর-নাচানি দেখে এত হাসবার কি আছে সোমা ভেবে পেল না। সে উত্তর দিল না।

আবার কী বলতে গিয়ে হঠাৎ সোমার দিকে তাকাল তপতী; সঙ্গে সঙ্গে তার হাসি থেমে গেল। সোমার মুখ লাল, চোয়াল শক্ত। কিছু একটা আন্দাজ

করে সে মৃন্ময়ের দিকে তাকাল। ধমকের গলায় বলল, 'কি হচ্ছে মৃন্ময়দা!'

মৃন্ময় হকচকিয়ে গেল, 'আরে ছোঁড়াটার টুইস্ট ঠিক হচ্ছে না; তাই একটু দেখিয়ে দিচ্ছি।'

কড়া গলায় তপতী বলল, 'চুপ করে বসো তো—'

এক পলক তপতীকে দেখল মৃন্ময়, তারপর দেখল সোমাকে। দেখতে দেখতে বিমূঢ়ের মতন ঝুপ করে বসে পড়ল।

চাপা গলায় তপতী বলল, 'এক গাড়ি লোকের সামনে নাচতে তোমার লজ্জা করল না! ছি! বন্ধুর কাছে আমার আর মান-ইজ্জৎ রইল না।'

মৃন্ময় বলতে চেষ্টা করল, 'না মানে—'

তপতী চেঁচিয়ে উঠল, 'চুপ কর—' তারপর সোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করল, 'কিছু মনে করিস না ভাই। মৃন্ময়দার মাথায় ছিট-ফিট আছে।'

সোমা এবারও চুপ করে থাকল।

গাইয়ে ছোকরাটা হয়তো বিপজ্জনক কিছুর আভাস পেয়েছিল। গান-টান থামিয়ে ভয়ে ভয়ে মৃন্ময়কে বলল, 'সাহাব, মেরা পাইসা—'

নিঃশব্দে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে দিতেই ছোকরাটা চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল। তারপর সবাই চুপচাপ। সোমা, তপতী, মৃন্ময়—তিনজন অপরিচিতের মতন পাশাপাশি বসে থাকল।

আরো ঘণ্টাখানেক পর ঘাটগাড়ি কাটিহার জংশনে পৌঁছে গেল।

স্টেশনে নেমে মৃন্ময় তপতীকে বলল, 'এখান থেকে কিসে পূর্ণিয়া যাবি? ট্রেনে, না ট্যাক্সিতে?'

তপতী বলল, 'ট্যাক্সিতে—'

'ট্রেনে গেলে কিন্তু জার্নিটা লাভলি লাগত—' মৃন্ময় চোরা চোখে একবার সোমাকে দেখে নিল। সোমার মুখ এখনও থমথমে গম্ভীর। মৃন্ময়ের কথা সে শুনেছে বলে মনেই হল না।

তপতী বলল, 'না-না, এখন শোভা দেখতে যাবার সময় নেই। সাড়ে বারোটা বাজে; দারুণ খিদে পেয়ে গেছে। তুমি চট করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে এস মৃন্ময়দা—'

মার্চের সূর্য এখন সোজা মাথার ওপর। সকালের দিকে রীতিমত শীত শীত করছিল, হিমে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। আর এই দুপুরবেলা বাতাস তেতে উঠেছে; বেশ গরম লাগছে।

মৃন্ময় ট্যাক্সি নিয়ে এল। ওরা উঠতেই গাড়িটা এক সেকেণ্ড আর দাঁড়াল

না ; সঙ্গে সঙ্গে স্টার্ট দিল।

তারপর দু' মিনিটের মধ্যে কাটিহার জংশন পিছনে ফেলে ট্যাক্সিটা হুস করে যেখানে এসে পড়ল তার দু'ধারে সবুজ কার্পেটের মতন মাঠ, টুকরো টুকরো বিহারী গ্রাম, একটানা পানিফলের বিল আর মাঝে মাঝে অনেকখানি জায়গা জুড়ে আম বাগান। ছোট ছোট সবুজ গুটিতে আমগাছগুলো বোঝাই হয়ে আছে। আর দেখা যাচ্ছিল বেঁটে বেঁটে অষ্টবক্র মুনির মত এক ধরনের অদ্ভুত গাছ। এমন গাছ আগে আর কখনও দেখে নি সোমা।

এক জানলায় বসে ছিল সোমা, আরেক জানলায় মৃন্ময়। মাঝখানে তপতী। হঠাৎ ওধার থেকে মৃন্ময় চেঁচিয়ে উঠল, 'মিস চ্যাটার্জী, ঐ ট্যারাবাঁকা গাছগুলো মার্ক করুন—'

সোমা যেমন বাইরে তাকিয়ে ছিল তেমনই তাকিয়ে থাকল।

খুব উৎসাহের গলায় মৃন্ময় বলল, 'ঐ গাছগুলোর নাম সীসম। এমন গাছ আপনি বাঙলা দেশে দেখতে পাবেন না।'

সোমা কোনরকম কৌতূহল বা আগ্রহ দেখাল না।

ঝুঁকে বসে আবার কি বোঝাতে যাচ্ছিল মৃন্ময়, তপতী বিরক্ত স্বরে বলল, 'তুমি কি একটুও মুখ বুজে থাকতে পার না মৃন্ময়দা?'

ঝপ করে আলো নিভে গেলে যেমন হয়, মৃন্ময়ের মুখটা তেমনি মলিন হয়ে গেল। বিব্রতভাবে বলল সে, 'আচ্ছা বাপু থামছি, আর একটাও কথা বলব না।'

কাটিহার থেকে পুরো এক ঘণ্টাও লাগল না, তার অনেক আগেই ওরা পূর্ণিয়ায় পৌঁছে গেল।

পূর্ণিয়ায় যে পাড়ায় তপতীদের বাড়ি তার নাম ভাট্টা। একেবারে সদর দরজায় ওদের নামিয়ে দিয়ে ট্যাক্সিটা চলে গেল।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে তপতীদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি। সামনের দিকে বিরাট ফুলের বাগান! ফুল বলতে শুধু গোলাপ। লাল, সাদা, ফিকে হলুদ—নানারঙের গোলাপে বাগান ছেয়ে আছে।

আজকাল কোন কিছুতেই মুগ্ধ হয় না সোমা; ফুটন্ত দুধের মতন টগবগে আবেগ তার খোয়া গেছে। তবু কয়েক পলক বাগানটার দিক থেকে চোখ ফেরাতে

পারল না সে। বলল, 'তোদের বাগনটা তো চমৎকার রে তপতী! এত গোলাপ, এত রকমের গোলাপ, আমি আর কখনও দেখি নি।'

তপতী হাসল, 'পূর্ণিয়ার লোকেরা আমাদের বাড়িটাকে কী বলে জানিস?'

'কী?'

'গোলাপবাড়ি।'

'সার্থক নাম।'

দু' হাতে দুই সুটকেশ, বেতের বাস্কেট আর বগলে হোল্ডঅল নিয়ে ওদের ঠিক পেছনেই আসছিল মৃন্ময়। বাগানের মাঝখান থেকেই সে গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল, 'ফুলমাসি আমরা এসে গেছি। দোলন—ঝুলন—পিণ্টু, তোরা কোথায় রে? শিগ্‌গির বেরিয়ে আয়—'

তপতীদের বাড়িটা পুরনো আমলের দোতলা। মোটা মোটা থাম, চওড়া চওড়া সিঁড়ি, গরাদহীন খড়খড়ি-ওলা বড় বড় জানলা, ঘুলঘুলিতে পায়রা—সব মিলিয়ে তার গায়ে উনিশ শতকের একটা গন্ধ যেন মাখানো।

তপতীরা সিঁড়ির কাছে আসবার আগেই দুটি কিশোরী আর একটি যুবক বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মেয়ে দু'টির বয়েস চোদ্দ থেকে ষোলর মধ্যে। এখনও শাড়ি-টাড়ি ধরে নি। যুবকটির বয়েস কুড়ি একুশের মতন। তিনজনেরই চোখে তপতীর আদল বসানো। এক পলক দেখেই টের পাওয়া যায়, ওরা তপতীর ভাইবোন।

তপতী ভাইবোনদের সঙ্গে সোমার আলাপ করিয়ে দিল। কিশোরী দুটির মধ্যে যে বড় তার নাম দোলন, ছোটটির নাম ঝুলন। ছেলেটি তপতীর একমাত্র ভাই; ডাকনাম পিণ্টু। ওরা সোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল সোমা বিব্রত মুখে বলল, 'থাক থাক, আজকাল আবার কেউ পায়ে হাত দেয় নাকি—'

পিণ্টু চমৎকার ছেলে। বলল, 'বা রে, আপনি আমাদের দিদি না?'

সোমার খুব ভাল লাগল ছেলেটাকে। স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'তুমি কী কর, পড়ছ?'

'হ্যাঁ। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট, এটা আমার ফাইনাল ইয়ার।'

তপতী বলল, 'বেশ মজা তো, তোরা সোমাকে প্রণাম করলি। আমাকে করবি না?'

পিণ্টু বলল, 'তোর প্রণামটা জমা থাক ছোটদি। ইয়ার-এণ্ডিংএ সব একসঙ্গে চুকিয়ে দেব।'

দোলন-ঝুলন বলল, 'আমরাও—'

ভাইয়ের মাথায় স্নেহভরে আল্‌তো করে একটা চাঁটি কষিয়ে দিল তপতী, 'মহা ওস্তাদ হয়ে উঠেছিস।'

সোমা অবাক, 'ব্যাপার কি রে, এক সঙ্গে প্রণাম চুকিয়ে দেবে মানে?'

তপতী হেসে ফেলল, 'ওরা আমাকে এমনিতে প্রণাম করে না। সারা বছরের প্রণাম জমিয়ে রাখে, তারপর বছরের শেষে পাওনা চুকিয়ে দেয়।'

সোমা রগড়ের গলায় বলল, 'সারা বছরে তোর ক'টা প্রণাম পাওনা হয় '

একটু ভেবে নিয়ে তপতী বলতে লাগল, 'নববর্ষে একটা, বিজয়ায় একটা, আমার জন্মদিনে একটা। সব মিলিয়ে চার-পাঁচটা তো হয়ই।'

'চার-পাঁচটা প্রণাম ওরা একসঙ্গে করে?'

তপতী মাথা হেলিয়ে দিল' 'হুঁ—'

সোমা হেসে ফেলল. 'বাবা, অফিসের ছুটির মতন প্রণামও যে জমানো যায়, আমার ধারণা ছিল না।'

পেছন থেকে আচমকা মৃন্ময় চেঁচিয়ে উঠল. 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ গল্প করবি তপী? আমার হাত কিন্তু ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

পিণ্টু ছুটে গিয়ে মৃন্ময়ের হাত থেকে একটা স্যুটকেশ আর হোল্ডঅলটা নিয়ে তাকে খানিকটা হাল্কা করল।

তপতী বলল. 'হ্যাঁ হ্যাঁ. এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল্, ভেতরে যাই। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল তপতী।

সোমাও তপতীর দুই বোনের কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। দু'জনের মধ্যে দোলন বড়, ঝুলন ছোট। সোমা দোলনকে বলল, 'তুমি কি পড়?'

'ক্লাস টেনে।'

'হিউম্যানিটিজ গ্রুপ?'

'না, সায়েন্স।'

'অঙ্কে তা হলে তোমার দারুণ মাথা—'

দোলন লজ্জা পেয়ে মুখ নামাল।

সোমা এবার ঝুলনকে বলল. 'তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?'

ঝুলন বলল. 'নাইনে—'

'তুমিও সায়েন্স গ্রুপের?'

'না, হিউম্যানিটিজ। ছোটদির মতন অঙ্ক-টঙ্ক আমার মাথায় ঢোকে না।'

গল্প করতে করতে ওরা থামওলা বিরাট বারান্দায় উঠে এল। আর তখনই বাড়ির ভেতর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে

পারল না সোমা। মনে হল, তিনি আসাতে দুপুরের সূর্যালোক যেন আরো অনেকখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বয়েস কত হবে? পঁয়তাল্লিশের বেশি কখনই না; দেখায় কিন্তু তিরিশ পঁয়তিরিশের মতন। গায়ের রঙ যেন শরতের রৌদ্রঝলক! নাক-মুখ-চোখ সব মিলিয়ে তিনি রূপের প্রতিমা। হাতভর্তি গোছা গোছা সোনার চুড়ি; তাঁর গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে। গলায় পুরনো আমলের তেঁতুলপাতা হার; নিটোল আঙুলে লাল পাথর বসানো আংটি। পরনে নক্‌শা-করা চওড়া-পাড় ধবধবে শাড়ি আর গরদের ব্লাউজ। কপালে মস্ত সিঁদুরের টিপ।

তপতী বলল, 'আমার মা—'

সোমা প্রণাম করবার জন্য ঝুঁকল কিন্তু পা ছোঁবার আগেই তপতীর মা তাকে বুকে তুলে নিলেন। সস্নেহে কোমল গলায় বললেন, 'তুমিই সোমা! এস মা, এস'—সবাইকে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে তিনি আবার বললেন, 'তোমাকে কিন্তু আরো আগেই আশা করেছিলাম মা। গেল বছর নভেম্বর মাসে তপী লিখেছিল, তোমাকে নিয়ে আসবে; আমরা পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর প্রতি মাসেই ও লিখে যাচ্ছে, তুমি আসছ। এতদিন পরে এলে।'

তপতী বলল, 'কত সাধ্যসাধনা করে ওকে আনতে হয়েছে তা তো জানো না। কলকাতা থেকে নড়তেই চায় না। কলেজের ক্লাস আর হোস্টেলে নিজের ঘর, এর মধ্যেই দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছে!'

আধফোটা জড়ানো গলায় সোমা কিছু একটা বলল, বোঝা গেল না।

তপতীর মা বললেন, 'তপী লিখেছিল, তোমরা লক্ষ্ণৌয়ে থাক?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'সেখানে যাও না?'

'যাই মাঝে মধ্যে।'

তপতী বলে উঠল, 'মাঝে মধ্যে না হাতী। জানো মা, আড়াই বছরে সোমা মোটে একবার লক্ষ্ণৌতে গেছে।'

সোমা বলল, 'একবার গেছি; তোকে বলেছে!' তাকে অত্যন্ত বিব্রত এবং চঞ্চল দেখাল।

তপতীর মা এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করলেন না।

কথায় কথায় ওরা বাড়ির ভেতর চলে এসেছিল। মাঝখানে প্রকাণ্ড বাঁধানো উঠোনের চারধারে বড় বড় খোলামেলা ঘর। তপতীর মা ওদের নিয়ে দক্ষিণ দিকের একটা ঘরে ঢুকলেন।

জানলার ধার ঘেঁসে পুরনো আমলের নকশা-করা ভারী খাট পাতা। তার ওপর ধবধবে বিছানা। আরেক ধারে ফুল লতাপাতা-আঁকা আলমারি, ড্রেসিং টেবল্, খান দুই সোফা, মাথার ওপর দুই ফলা-ওলা ফ্যান।

তপতীর মা বললেন, 'এটা তোমাদের ঘর। যে ক'দিন আছ, তোমরা দুই বন্ধু এ ঘরে থাকবে।'

এক পলক চারিদিক দেখে নিল সোমা। ঘরটা বেশ নিরিবিলি; তার খুব পছন্দ হয়ে গেল।

তপতীর মা আবার বললেন, 'একটু বিশ্রাম-টিশ্রাম করে স্নান করে নাও। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোও। নিশ্চয় কাল ট্রেনে ঘুম হয় নি—'

তপতী বলল, 'আমি ঘুমিয়েছি। তবে সোমাটা ঘুমোয় নি; ওর ভীষণ ইনসম্‌নিয়ার ধাত। ঘুমের বড়ি না খেলে ঘুম আসে না।'

তপতীর মা কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। ক্রমশ তাঁর কপাল কুঁচকে যেতে লাগল। এক সময় বললেন, 'এ তো ভাল কথা না মা; কি এমন বয়েস তোমার। এর মধ্যেই যদি ঘুমের বড়ি খেতে হয়—না না, তুমি ভাল ডাক্তার দেখাবে, বুঝলে?'

সোমা হাঁ-না'র মাঝামাঝি মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বলল না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, পলকহীন তাকিয়ে আছে মৃন্ময়; তাদের সঙ্গে সঙ্গে স্যুটকেশ-টুটকেশ নিয়ে এ ঘরে ঢুকে পড়েছিল সে। চোখাচোখি হতেই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল সোমা।

তপতীর মা বললেন, 'আচ্ছা আমি এখন যাই, তোমরা বেশি দেরি কর না—' তিনি চলে গেলেন। দোলন-ঝুলন-পিন্টু তার সঙ্গে গেল।

একদৃষ্টে সোমাকে লক্ষ্য করছিল মৃন্ময়, নিঃশব্দে মালপত্র নামিয়ে রেখে সোমাকে দেখতে দেখতে সেও চলে গেল।

স্নান-টান সেরে তপতী সোমাকে খাবার ঘরে নিয়ে এল। এ ঘরটাও বেশ বড়সড়। মাঝখানে প্রকাণ্ড টেবল্। টেবলটাকে ঘিরে সিংহাসনের মতন অনেকগুলো চেয়ার। মাথার ওপর নাইনটিন ফরটি মডেলের ফ্যান ঘুরছে।

সোমার আসবার আগেই দোলন ঝুলন পিন্টু এবং মৃন্ময় খাবার ঘরে এসে বসে ছিল। তপতীর মা-ও ছিলেন ওঘরে।

তপতীদের দেখেই মৃন্ময় চেঁচিয়ে উঠল, 'তোদের জন্যে ঝাড়া একটি ঘণ্টা বসে আছি। তাড়াতাড়ি বসে পড় বাপু। খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।'

বসতে বসতে তপতী বলল, 'আমাদের জন্যে বসে থাকতে কে বলেছিল?

'তুমি খেয়ে নিলেই পারতে—'

'খেয়ে নেব! বেশ বলেছিস। বাড়িতে গেস্ট আছে না—'

'ও বাবা—' তপতী চোখ গোল করল; ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'তুমি এত ফর্মালিটি-টর্মালিটি কবে থেকে মানতে শুরু করলে?'

মৃন্ময় দুই হাত চিত করে কাঁধ ঝাঁকাল, 'ফর্মালিটির ধার ধারতে আমার বয়েই গেছে। আমি তো খেতেই চেয়েছিলাম—ফুলমাসি দিল না যে। বলল, তোর বন্ধু কী ভাববে—'

সোমার মুখ লাল হয়ে উঠল।

তপতীর মা হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন, 'ভাববেই তো। আচ্ছা তোরা একটু বোস, আমি ভাত-টাত নিয়ে আসি।'

একটু পর খাবার-টাবার এসে গেল। টেবল্ চেয়ারে সাহেবী ব্যাপার কিন্তু খাওয়াটা একেবারে দিশী মতে। বড় বড় কাঁসার থালা এবং বাটিতে ভাত-মাছ ডাল-তরকারি সাজিয়ে দিলেন তপতীর মা। একটা বেহারী ঠাকুর হাতের কাছে সব যুগিয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল।

সবাইকে খেতে দিয়ে একটা চেয়ারে বসলেন তপতীর মা। কার পাত খালি হয়ে যাচ্ছে, কার কী দরকার, লক্ষ্য রাখতে লাগলেন।

সোমা খাচ্ছিল আর মাঝে মাঝে তপতীর মাকে দেখছিল। ইচ্ছে করে যে দেখছিল তা নয়, তপতীর মা দুরন্ত আকর্ষণে যেন তার চোখ দু'টিকে নিজের দিকে টেনে রাখছিলেন।

তপতীর মা হয়তো লক্ষ্য করেছিলেন। বললেন 'আমায় কিছু বলবে, সোমা?'

'না মাসিমা—' সোমা মাথা নাড়ল, 'আমি আপনাকে দেখছি।'

'আমাকে দেখছ!' তপতীর মা অবাক।

'হ্যাঁ, আপনার মতন সুন্দর মানুষ আমি আর কখনও দেখি নি মাসিমা।'

তপতীর মা লজ্জা পেয়ে গেলেন; তাঁর কান আরক্ত হল, 'কি যে বল—'

তপতী ওধার থেকে বলে উঠল, 'জানিস সোমা, আমরা কেউ মা'র সঙ্গে কক্ষনো রাস্তায় বেরুই না।'

সোমা বিমূঢ়ের মতন জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'লোক বিশ্বাসই করতে চায় না আমরা এই মায়ের ছেলেমেয়ে। সবাই ভাবে সুন্দর বউটা কোত্থেকে কাকের ছানা বকের ছানা জোটাল!'

দোলন চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছিল। ফস করে বলল, 'সেবার নতুন এস. পি. সাহেবের স্ত্রী আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। দিদি কলকাতায় ছিল,

দাদা পাটনায়। আমাকে আর ঝুলনকে দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, এরা কারা?' মা বলল, 'আমার মেয়ে।' ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার নিজের ছেলেমেয়ে, না সতীনের?'

তপতীর মা বিব্রত মুখে বললেন, 'মেয়েদের কথা শোন!'

টেবলের শেষ মাথায় বসে ছিল মৃন্ময়। বলল, 'খুব ভাল লাগছে, না ফুলমাসি?'

তপতীর মা বললেন, 'কী ভাল লাগছে রে?'

'এই যে সবাই মিলে তোমার রূপের এত প্রশস্তি গাইছে। তোমাকে নিশ্চয়ই খুব ফুলে যাচ্ছ।।'

ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেললেন তপতীর মা, 'চুপ কর হনুমান—'

সোমার মনে হল, ভদ্রমহিলা রাগ করতে জানেন না।

একটু নীরবতা। তারপর তপতীর মা সোমাকে বললেন, 'বাঁদরগুলো সমানে জ্বালাচ্ছে। তোমার সঙ্গে কথাই বলতে পারছি না মা। তোমরা লক্ষ্ণৌতে কদ্দিন আছ?'

সোমা বলল, 'অনেকদিন। প্রায় দু-পুরুষের মতন। আমার ঠাকুরদা তাঁর পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সে ওখানে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই আছি।'

'ওখানে বাড়িটাড়ি করেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা-মা?'

'আছেন।'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সোমাদের বাড়ির অনেক খবর নিলেন তপতীর মা। তারপর বললেন, 'তোমরা ক' ভাইবোন?'

'দুই ভাই, দুই বোন। আমি সবার ছোট।'

'অন্য ভাইবোনের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

ওধার থেকে তপতী বলল, সোমার বিয়ের জন্যেও তো লক্ষ্ণৌ থেকে ওর বাবা-মা তাড়া দিচ্ছেন। ও কিছুতেই বিয়ে করতে চায় না।'

তপতীর মা বললেন, 'তা তো দেবেনই। মেয়ে যত লেখাপড়াই শিখুক আর যা-ই করুক, বিয়ে দিতে না পারলে কোন বাপ মা-ই নিশ্চিন্ত হতে পারে না।' তারপর সোমাকে বললেন, 'তোমার বাবা-মা তো বললে বেশ অসুস্থ—'

'হ্যাঁ—' আবছা গলায় সোমা উত্তর দিল।

'বিয়েটা করে ফেল মা। যে বয়েসের যা ; জীবনে ওটা প্রয়োজন।'

সোমা চুপ করে রইল। শুধু দূর থেকে মৃন্ময় লক্ষ্য করল, মুখটা একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে সোমার। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। সে অনুমানও করতে পারল না, এই মুহূর্তে সোমার রক্ত মাংসে কি দারুণ যুদ্ধ চলছে।

হঠাৎ মৃন্ময় বলল, 'তুমি কি ফুলমাসি!'

'কেন, কী!' মৃন্ময়ের বলার ধরনে তপতীর মা চমকে উঠলেন।

'নিজেরা তো বিয়ে-টিয়ে করে ল্যাজ কেটে বসে আছ। আবার অন্যেরও ল্যাজও কাটতে চাইছ। কেন বাপু, আজাদী চিড়িয়া আকাশে উড়ছে, তাকে উড়তেই দাও না—'

তপতীর মা চোখ পাকালেন, 'তোর ল্যাজও এবার কাটাব। আজাদী চিড়িয়া হয়ে সারা জীবন উড়ে বেড়াবি, সেটি হবে না।'

দোলনের পাশ থেকে ঝুলন দুম করে বলে বসল, 'মৃন্ময়দার ল্যাজ তো একবার কাটা গিয়েছিল।'

পলকে সমস্ত ঘরটার হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্য সবাই বোবা।

ওদিকে হাজার হাতে এলোপাথাড়ি কালি ছুঁড়ে কেউ যেন মৃন্ময়ের মুখটা একেবারে বিকৃত কদর্য করে দিল। তার চোখের ওপর ধূসর সরের মতন কী পড়েছে। হাত-পা-ঠোঁট অসহ্য কাঁপছিল। এক মিনিটও না। তারপরেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে হেসে উঠল মৃন্ময়, 'ঠিক বলেছিস ঝুলন। ল্যাজ কাটার কথাটা আমার একদম মনে থাকে না। সবসময় হৈ-চৈ করে কাটাই তো—' বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল মৃন্ময়, 'কিন্তু যেই একলা হই, টের পাই সেই কাটার ঘা'টা—'

তপতীর মা ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর, যত সব আজে বাজে কথা—'

মৃন্ময় হাসতে লাগল, 'ঠিক আছে ফুলমাসি ; এই মুখে চাবি দিলাম। তুমি তো আবার ঐ ব্যাপারটা পছন্দ কর না।' বলেই ঘাড় গুঁজে বড় বড় গ্রাসে ভাত মুখে পুরতে লাগল।

খেতে খেতে থমকে গিয়েছিল সোমা। সে মৃন্ময়ের দিকে তাকাল ; তাকিয়েই থাকল। মনিহারি ঘাটে আলাপ-টালাপ হবার পর এই প্রথম মৃন্ময়কে স্থির পলক-হীন চোখে দেখল সোমা। একবার তার ইচ্ছা হল, তপতীকে জিজ্ঞেস করে মৃন্ময়ের ব্যাপারটা জেনে নেয়। পরক্ষণেই মনে পড়ল, সে একজন অধ্যাপিকা : গেঁয়ো মেয়েদের মতন কৌতূহল তার অন্তত শোভা পায় না।

হঠাৎ কি মনে পড়তে দ্রুত মুখ তুলল মৃন্ময়, 'ফুলমাসি, মেসোকে তো দেখছি না।'

তপতীও প্রায় একই সুরে বলল, 'বাবা কোথায় মা?'

তপতীর মা বললেন, 'আর কোথায়, সকালবেলা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে সাইকেলে করে যেখানে যান।'

'বা রে—' আদুরে কিশোরীর মতন মুখ ভার করল তপতী, 'আমরা যে আসব বাবা জানে না?'

তপতীর মা বললেন, 'জানে বইকি—'

'তবে বাড়িতে থাকল না যে?'

'নেশা। সকাল হলেই বেরিয়ে পড়া চাই।'

'তুমি থাকতে বললে না কেন?'

'বলেছিলাম তো। তোর বাবা বললে তপীরা এসেই তো আর চলে যাচ্ছে না। সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে' খন।'

'সোমা কী ভাবল বল তো?'

সোমা ওপাশ থেকে বলে উঠল, 'রোজ সকালেই বেরিয়ে যান মেসোমশাই?'

'রোজ—' তপতীর মা হাসলেন।

'কোথায় যান?'

'বন-বাদাড়ে—'

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতন তাকিয়ে থাকল সোমা, তপতীর বাবার সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করল না।

কথায় কথায় খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সোমার পাতের দিকে তাকিয়ে তপতীর মা বলে উঠলেন, 'এ কি মা—তুমি কিছুই তো খাও নি। সব পড়ে আছে।'

'না না, অনেক খেয়েছি।'

'তোমাকে আর দু'খানা ঝালের মাছ দিই—'

দু' হাত দিয়ে পাত ঢেকে সোমা ভয়ের গলায় বলল. 'আমার পাতে প্রথমেই যা দিয়েছেন তা আমার তিনবেলার খাবার। তার ওপর আবার যদি দ্যান মরেই যাব মাসিমা।'

'তুমি লজ্জা করছ না তো মা?'

টেবিলের শেষ মাথা থেকে ধাঁ করে মৃন্ময় বলে বসল, 'পেট ভরে না খেলে নিজেই কষ্ট পাবে; আমাদের কি—'

সোমার চোখ ঈষৎ কুঁচকে গেল। মৃন্ময়ের দিকে না তাকিয়ে তপতীর মাকে বলল, 'লজ্জা করব কেন? আমি কতটা খাই তপতীকেই জিজ্ঞেস করুন না—'

'নাঃ, কিছুই খেতে পার না দেখছি—' তপতীর মা হাল ছেড়ে দিলেন।

মৃন্ময় আচমকা আবার মন্তব্য করল, 'একেবারে পক্ষীর আহার। খাবেন এইটুকু, রাত্তিরে ইনসমনিয়া—আছেন ভাল।'

একটু আগে ওদের কথাবার্তা শুনে সোমার মনে হয়েছিল মৃন্ময়ের জীবনে কোথাও দুঃখ আছে। নিজের অজান্তেই খানিকটা সহানুভূতি বোধ করেছিল। এই মুহূর্তে তার মুখ আবার শক্ত হয়ে উঠল। লোকটার রুচিহীনতা অসহ্য।

খাওয়া-দাওয়ার পর সোমা আর তপতী তাদের নির্দিষ্ট ঘরটায় চলে এল। বোতাম টিপে মাথার ওপরকার ফ্যানটা চালিয়ে দিয়ে তপতী বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

সোমা শুধলো, 'কি রে?'

'মৃন্ময়দার ওপর খুব চটে গেছিস, না?'

সোমা উত্তর দিল না, তার মুখ কঠিন হয়ে উঠল।

বিছানায় এসে টান-টান শুয়ে পড়ল তপতী। বলল, 'রাগ করিস না ভাই; মৃন্ময়দাটা কোন রকম ফর্মালিটি জানে না। মুখে যা আসে দুমদাম বলে ফেলে। একেক সময় খুব খারাপ লাগে। কিন্তু মানুষটা ভারি সরল রে। দু চারদিন মিশলে বুঝতে পারবি, কোন রকম ঘোরপ্যাঁচ নেই।'

সোমা আবছা জড়ানো গলায় কিছু বলল, বোঝা গেল না।

পাশ ফিরতে ফিরতে তপতী বলল, 'মৃন্ময়দাটা অদ্ভুত লোক। দারুণ দুঃখী, জীবনে ভীষণ ডিপ্রাইভড্ হয়েছে, অথচ বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। সব সময় হৈ-হুল্লোড় করছে—' তার গলা দ্রুত ঘুমে বুজে আসতে লাগল।

কোন ব্যাপারেই সোমার বিশেষ আগ্রহ নেই। সে উদাসীন, কৌতূহলশূন্য। তবু নিজের অজান্তেই ফস করে বলে বসল, 'ডিপ্রাইভড্ হয়েছে মানে?'

'সে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ; পরে শুনিস—'

কি ভেবে সোমা বলল, 'উনি তো দিল্লী থাকেন; তখন তাই বললি না?'

'হ্যাঁ—' ঘুমন্ত গলায় উত্তর দিল তপতী।

'একলাই থাকেন?'

কি যেন অস্পষ্টভাবে বলল তপতী, তারপরেই তার গলা ডুবে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার নাক ডাকতে লাগল। ভারি বিশ্রী অভ্যাস তপতীর।

সোমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল কোথায় যেন সে দেখেছে স্রেফ নাক ডাকার জন্য একটা ডাইভোর্স হয়ে গেছে। পরক্ষণেই সে জানলার বাইরে গোলাপ বাগানের দিকে তাকাল। ওখানে ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছিল, আর ফড়িং। ফাল্গুনের উল্টোপাল্টা এলোমেলো হাওয়ায় ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় চোখ জুড়ে আসতে লাগল সোমার। তপতীর পাশে শোয়ামাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল বিকেলের আলো মলিন হয়ে এসেছে। রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতন। রাস্তার লম্বা লম্বা গাছগুলোর ছায়া দীর্ঘ হয়ে তপতীদের বাগানে এসে পড়েছে। বাইরে অনেক পাখি ডাকছিল, অজস্র গোলাপের গন্ধে ফাল্গুনের চটুল বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে।

বিছানায় শুয়েই বড় বড় জানলার মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখা যায়। শীতের পর আকাশ এখন ঝকঝকে নীল—পালিশ-করা আয়নার মতন।

পাশ ফিরে তপতীকে ডাকতে গিয়ে সোমা দেখল, সে জায়গাটা ফাঁকা। ঘুম ভাঙবার পর কখন সে উঠে গেছে, কে জানে। সোমা শুয়েই থাকল। আকাশ দেখতে লাগল, গাছের ছায়া দেখতে লাগল, পাখিদের চেঁচামেচি শুনতে লাগল। মোটামুটি এসব ভালই লাগছিল তার, তবু কি রকম এক অন্যমনস্কতা আর বিষাদ যেন তাকে ঘিরে থাকল। একলা হলেই এই বিষাদটা সোমাকে পেয়ে বসে। আর তখনই বিতৃষ্ণার অতল থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়ায় বিকাশ।

হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল তপতী। এক মুখ হেসে বলল, 'ঘুম ভেঙেছে তা হলে? আমি তো ভেবেছিলাম আজ আর উঠবি না।'

সোমাও হাসল, কিছু বলল না।

তপতী আবার বলল, 'আর শুয়ে থাকতে হবে না, চটপট উঠে পড়—'

'মুখ-টুখ ধুয়ে চা খেয়ে রেডি হয়ে নিবি—'

'কী ব্যাপার?' হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল সোমা।

'কী আবার ব্যাপার, এই বিকেলবেলা ঘরে বসে থাকবি নাকি? আমাদের শহরটা কেমন, একটু ঘুরে ফিরে দেখবি না? মৃন্ময়দা টাঙ্গা ডাকতে গেছে। এসেই কি রকম তাড়া লাগায় দেখিস—'

মৃন্ময়ের কথায় সোমার মুখে ছায়া পড়ল। বলল, 'আজই বেরুবি?'

তপতী বলল, 'আজ বেরুলে ক্ষতিটা কী?'

'না, ক্ষতি কিছু না। সারা রাত ট্রেন জার্নি করে এসেছি; খুব টায়ার্ড লাগছে। এখন আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না।' মুখটা করুণ করে সোমা তাকাল। 'প্লীজ মনে কিছু করিস না ভাই—'

আচমকা দরজার কাছ থেকে দুম করে কেউ বলল, 'আপনি একটা ল্যাক্টাভ্যাগাস—'

চমকে সেদিকে তাকাল সোমা; দরজার ঠিক ওপরেই মৃন্ময় দাঁড়িয়ে আছে। সে কখন এসেছে, কে জানে! কতক্ষণ তাদের কথা শুনছে, তাই বা কে বলবে। রাগে চোখমুখ লাল হয়ে উঠল সোমার।

তপতী বলল, 'ল্যাক্টাভ্যাগাস—তার মানে কী?'

মৃন্ময় বলল, 'কে জানে কি মানে। বলতে বেশ লাগল তাই বলে ফেললাম।'

তপতী বালিকার মতন সারা গা দুলিয়ে হেসে উঠল, 'তুমি একটা রাবিশ।'

মৃন্ময় বলল, 'ঠিক আছে রাবিশই। এখন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে তোরা। টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।'

'জাস্ট টেন মিনিট্স সময় নিচ্ছি।'

'নো, ফাইভ মিনিট্স। কাপড়-চোপড় বদলাতে এর চাইতে বেশি সময় লাগে নাকি?'

'বা রে, চা খাব না?'

'চা বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।' মৃন্ময় আর দাঁড়াল না, বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

এই অসভ্য লোকটার সঙ্গ অসহ্য। সোমা বলল, 'আমি কিন্তু যাব না।'

সোমা যে ভেতরে ভেতরে খুবই রেগে গেছে, তপতী লক্ষ করে নি। অসহিষ্ণু গলায় সে বলল, 'দিন দিন বুড়িয়ে যাচ্ছিস, কি যে স্বভাব হচ্ছে তোর। কলকাতায় হোস্টেলের ঘর থেকে বেরুস না; এখানে এসেও যদি ঘরেই বসে থাকবি তবে আসার মানে কী?' হাত ধরে এক টানে সোমাকে বিছানা থেকে নামিয়ে আনল তপতী; তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করল, 'চল্, আজ তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব।' যে ভাবে সরলা কিশোরীকে চতুর পুরুষ ফুঁসলায়

তপতীর গলার স্বর অনেকটা সেই রকম।

সোমা বলল, 'কী দেখাবি?'

'সেটা এখন বলব না; ক্রমশ প্রকাশ্য।'

সোমা শেষ চেষ্টা করল, 'কাল দেখলে হত না?'

'উঁহু আজই—' প্রায় টানতে টানতে সোমাকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল তপতী।

এক কলেজে বছর তিনেক কাজ করছে ওরা। প্রথম দিন থেকেই সোমা দেখছে, মেয়েটা যেন সব সময় টগবগ করে ফুটছে। একটুতেই সে উচ্ছ্বসিত, একটুতে তার মধ্যে ঢেউ ওঠে। আর যখন যেটা মাথায় চাপে সেটা না করে ছাড়ে না। কাজেই তার ইচ্ছায় নিজেকে না সঁপে দিয়ে রেহাই পাওয়া গেল না।

শাড়ি বদলাতে বেশিক্ষণ লাগল না। তারপর তপতীরা বেরিয়ে পড়ল। তপতীর মা চা খাবার কথা বলেছিলেন, মৃন্ময় সে সময় দিল না। দোলন ঝুলন যেতে চেয়েছিল; তাদের কি একটা পরীক্ষা সামনে, তাই নেওয়া হল না।

বাড়ি থেকে বেরুলেই দুর্গাবাড়ি। তার গায়েই একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে ছিল। সোমা আর তপতী পেছনের সীটে বসল। মৃন্ময় বসল সামনের সীটে, কোচোয়ানের পাশে। সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গা চলতে শুরু করল।

একটু পর খেয়ার রাস্তা পেরিয়ে জমজমাট বাজারের কাছে এসে পড়ল টাঙ্গাটা। কলকাতার অনুকরণে এখানে কিছু দোকানপাট—ঘড়ির দোকান, রেডিওর দোকান, রেডিমেড পোশাকের দোকান। কাঁচের শো-উইণ্ডোতে সাজিয়ে রাখা রয়েছে। দু-একটা ছোটখাটো রেস্তোরাঁও চোখে পড়ল।

মৃন্ময় সোমাকে বলল, 'বুঝলেন ম্যাডাম, এটা আমাদের পূর্ণিয়ার চৌরঙ্গী।'

সোমা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল।

মৃন্ময়ের হয়তো দু' কান কাটা; সে বলতে লাগল, 'কলকাতার তুলনায় অবশ্য কিছুই না, তবু নিজগুণে ক্ষমা করে নেবেন।'

সোমা চুপ। মৃন্ময় এবার তপতীকে বলল, 'কি রে তপী, কোন্ দিকে যাবি?'

তপতী বলল, 'যেদিকে খুশি—'

মৃন্ময় চট করে কি ভেবে নিল। আড়ে আড়ে একবার তাকিয়ে চোখ কুঁচকে ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'যদি খাদাঙ্কির দিকে যাই?'

ঠোঁট কামড়ে আঁচলে আঙুল জড়াতে জড়াতে তপতী বলল, 'আহা, খাদাঙ্কি ছাড়া যেন পূর্ণিয়ায় আর কোন জায়গা নেই—'

'নিশ্চয় আছে। কিন্তু কেন বাপু পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ—'

লাজুক হাসল তপতী। আরক্ত মুখে বলল, 'তোমাকে আমি বলেছি!'

মৃন্ময় বলল, 'মুখ ফুটে না বললে কি আর বোঝা যায় না? ওখানে যাবার জন্যে তো মুখিয়েই আছিস।'

'আমি কিন্তু কিছুতেই খাদাঙ্কি যাব না।'

'যাবি যাবি, হাজার বার যাবি। নাকের ডগায় বড়শি আটকানো আছে, না গিয়ে কি পারবি? এখন না গেলেও লুকিয়ে চুরিয়ে তো যাবিই—'

মৃন্ময় কোচোয়ানকে বলল, 'খাদাঙ্কি চালাও—'

সোমা তপতীকে লক্ষ করছিল। তিন বছর ধরে সে দেখছে, তপতীটা দারুণ হুল্লোড়বাজ। লজ্জা-টজ্জা বলে কিছু নেই। কিন্তু খাদাঙ্কি যাবার কথায় তার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে। অবাক সোমা খুব নীচু গলায় বলল, 'খাদাঙ্কি যাবার কথায় একেবারে লজ্জাবতী লতাটি হয়ে গেলি, কী ব্যাপার রে?'

চকিতে মৃন্ময়কে দেখে নিয়ে গলার স্বর অতলে নামায় তপতী, 'একটা দারুণ জিনিস দেখাব বলেছিলাম না? সেই জিনিসটা ঐ খাদাঙ্কিতেই আছে।'

'জিনিসটা কি রে?'

'গেলেই দেখতে পাবি। একখানা যা সারপ্রাইজ দেব না!'

একটু ভেবে সোমা বলল, 'টাঙ্গা খাদাঙ্কিতে আসবে তা হলে তুই জানতিস?'

'নিশ্চয়ই জানতাম। মৃন্ময়দার সঙ্গে যখন বেরিয়েছি তখন সে কি আর ওখানে না গিয়ে ছাড়বে। যা ফাজিল—'

এদিকে রাস্তায় যারা যাচ্ছিল তারা প্রায় সবাই মৃন্ময়কে ডেকে ডেকে কথা বলছিল। 'কেমন আছেন মৃন্ময়বাবু? কবে এলেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি। মৃন্ময়ও কারোকে ডাকছিল, 'এ বিমুণ ক্যায়সা হায় রে?'

'আচ্ছা'—বিমুণ নামধারী লোকটা বলে, 'আপ ক্যায়সা?'

'বহুত বু—। বালবাচ্চা আচ্ছা তো?'

'জী—'

কিংবা, 'এ রামলগন সিং—'

রামলগন নামধারী লোকটা বলে, 'আরে বাপ, মিরিনময় বাবু! মৃন্ময়বাবু! আপ কব পূর্ণিয়া আয়া?'

মৃন্ময় বলে, 'পরশু রোজ—'

'আরে বাপ পরশু রোজ আয়া, হাম নহী জানে—'

'জানবি কি করে? দেখা তো হয় নি। এখনও তাড়ি খাস, বউকে পেটাস?'

এক হাত জিভ কেটে রামলগন প্রায় আঁতকেই ওঠে, 'আরে বাপ, দারু-উরু কব ছোড় দিয়া—'

'ব্যাটা ধর্মপুত্তুর হয়ে উঠেছ।' ইত্যাদি ইত্যাদি—

তপতী সোমাকে বলল, 'মৃন্ময়দা এখানে দারুণ পপুলার। পূর্ণিয়ার এমন কেউ নেই যে ওকে চেনে না। সবার সঙ্গে ওর খাতির।'

সোমা কোনরকম উৎসাহ দেখাল না।

এক সময় বাজার এলাকাটা পেছন ফেলে টাঙ্গাটা খানিক এগিয়ে বাঁ ধারে ঘুরল, শিরদাড়ার মত সোজা একটা রাস্তা এখান থেকে পুবে গেছে। দু'ধারে বাড়িঘর। বেশির ভাগই টিনের চালের, মাঝে-মধ্যে পুরনো আমলের কিছু একতলা। আচমকা বিশাল কম্পাউণ্ডওলা একটা তিনতলাও চোখে পড়ল।

রাস্তায় ভিড় টিড় বিশেষ নেই, দু-চারটে সাইকেল-রিক্শা হুস হুস বেরিয়ে যাচ্ছে, কদাচিৎ এক আধটা টাঙ্গা। কলকাতার হৈ-চৈ, ট্রাফিক আর জনস্রোতের কথা মনে পড়ল সোমার। সর্বক্ষণ ফুটন্ত টগবগে সেই শহরটির তুলনায় এ শহর কত নির্জন, কত স্তিমিত আর নিরুত্তেজ। সোমার স্নায়ু জুড়িয়ে আসতে লাগল।

রাস্তায় লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে মৃন্ময় সোমাকে বলল, 'এই রাস্তাটা সোজা খ দার্জিলিং আর লাইন বাজার হয়ে হাইওয়েতে মিশেছে।'

লোকটাকে কে যে গাইডের ভূমিকা নিতে বলেছে, সে-ই জানে। সোমা উত্তর না দিয়ে উদাসীন গম্ভীর মুখে বসে থাকল।

যাই হোক রাস্তাটা চেনা চেনা লাগছিল। সোমা তপতীকে আস্তে করে বলল, 'এই পথটা দিয়ে আজ দুপুরে আমরা তোদের বাড়ি গেছি না?'

তপতী উত্তর দেবার আগেই টাঙ্গাওলার পাশ থেকে মৃন্ময় চেঁচিয়ে উঠল, 'ঠিক ধরেছেন আপনার মেমারি তো টেরিফিক শার্প দেখছি, একবার গিয়েই রাস্তাটাকে ঠিক ঠিক মনে করে রেখেছেন। আমার আবার বুঝলেন'—নিজের মাথাটা দেখিয়ে মৃন্ময় বলল, 'এটার ভেতর গোবর পোরা। একবারে তো পারবই না, সাতবার দেখলেও মনে থাকবে কিনা সন্দেহ।'

দাঁতে দাঁত চেপে রইল সোমা। এই গায়ে-পড়া বাজে টাইপের বাচাল লোকটাকে অনেক আগেই ঠাণ্ডা করে দিতে পারত, নেহাত তপতীর দাদা তাই চুপ করে আছে। আরেকটু বাড়াবাড়ি দেখলে নির্ঘাৎ চড় কষিয়ে দেবে।

কিছুক্ষণ চলার পর ধবধবে সাদা বিরাট একখানা মসজিদ পড়ল, তার কারুকাজ-করা গম্বুজে শেষ বেলার আলো এসে পড়েছে। মৃন্ময় বলল, 'এই মসজিদটার বয়েস অনেক। কেউ কেউ বলে সেই নবাবী আমলে তৈরি হয়েছিল।'

সোমা উত্তর দিল না।

মসজিদ পেরিয়ে আরো কিছুটা গিয়ে একটা তেরাস্তার মুখে এসে মৃন্ময় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'এ বগেডিলাল রুখো—রুখো।' টাঙ্গাওলার নাম বগেডিলাল। টাঙ্গা থেমে গেল।

মৃন্ময় তপতীর দিকে ফিরে ঠোঁট টিপে কৌতুকের গলায় বলল, 'যা সোমেশের বাবা-মা'র সঙ্গে একটু দেখা করে আয়।'

মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে তপতী বলল, 'আজ থাক, পরে একদিন যাব।'

'না-না, আজই যা। বুড়োবুড়ি একলা পড়ে থাকে; তুই গেলে খুব খুশি হবে।'

তপতী নখ খুঁটতেই থাকল।

এবার আর কৌতুক-টৌতুক না, সস্নেহ কোমল স্বরে মৃন্ময় বলল, 'যা—যা—তোর বন্ধুকেও নিয়ে যা।'

'তুমি যাবে না?'

'না, আমার ওপর বুড়োবুড়ি ভয়ানক চটা আছে, দেখলেই ক্ষেপে উঠবে।'

তপতী হাসল, 'ক্ষেপবার মত কাজ করলে ক্ষেপবে না?'

মৃন্ময় বলল, 'আচ্ছা তোরা তাড়াতাড়ি ঘুরে টুরে আয়। আবার রাত করে আসিস না। আমি ততক্ষণ বগেডিলালের সঙ্গে গল্প করছি।'

সোমাকে নিয়ে তপতী নেমে পড়ল। তারপর যে রাস্তাটা সোজা ডানদিকে চলে গেছে সেটা ধরে হাঁটতে লাগল।

একটু আগে মৃন্ময় আর তপতী যা বলছিল তার কিছুই বুঝতে পারছিল না সোমা। মৃন্ময়ের সামনে কিছু জিজ্ঞেস করতেও তার ইচ্ছে হয় নি, কোন কথায় কি ইতর রসিকতা করে বসবে, লোকটাকে বিশ্বাস নেই।

বন্ধুকে একলা পেয়ে সোমা যখন কিছু বলতে যাবে সেই সময় ওরা একটা বড় দোতলা বাড়ির সামনে এসে গেছে। কাঠের গেট খুলতে খুলতে তপতী বলল, 'আর মাস ছয়েক পর পূর্ণিয়া এলে তুই গোলাপ বাড়িতে উঠতিস না, তোকে এখানে এনেই তুলতাম।'

'তার মানে?'

আলতো করে সোমার কাঁধে একটা টোকা দিয়ে তপতী বলল, 'এক নম্বরের হাঁদারাম তুই, মাথায় তোর কিচ্ছু নেই।'

বিদ্যুৎ চমকের মত কি একটা আভাস পেয়ে গেল সোমা। বলল, 'তা হলে কি এটা তোর—'

'ভাবী শ্বশুর বাড়ি।'

'এই দারুণ জিনিসটা দেখাবার কথাই তখন বলেছিলি?'

'ইয়েস ফ্রেণ্ড।'

'সোমেশ তাহলে—'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে তপতী বলল, 'আমার হৃদয়েশ্বর।'

'তিন বছর একসঙ্গে আছি, এই খবরটা তো আগে দিস নি—'

'ভেবেছিলাম, পূর্ণিমায় এনে তোকে সারপ্রাইজ দেব।'

সোমা খুব আগ্রহের গলায় বলল, 'দারুণ সারপ্রাইজ দিয়েছিস। এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে তোর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে—'

দু'হাতের সবগুলো আঙুল এবং মাথা একসঙ্গে নেড়ে তপতী বলল, 'ওটি পারব না।'

'কেন?'

'প্রভু এখন ইণ্ডিয়ার বাইরে, আমেরিকায় রিসার্চ করছেন।'

'তোদের ক'দিনের আলাপ?'

'সেই ছেলেবেলা থেকে। এক শহরেরই ছেলে মেয়ে আমরা।'

সোমা হাসল, 'বেশ দীর্ঘমেয়াদী ব্যাপার।'

তপতীও হাসল, 'যা বলেছিস।'

হঠাৎ কি মনে পড়তে সোমা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বুড়োবুড়ি মানে তোর শ্বশুর মৃন্ময়বাবুকে দেখলে ক্ষেপে যাবে কেন?'

'আর বলিস না, মৃন্ময়দা মহা ফাজিল। বুড়োবুড়ির বিদঘুটে কার্টুন এঁকে একবার উপহার দিয়েছিল, তাতেই চটে আছে।'

সোমা কিছু বলল না। মৃন্ময় সম্বন্ধে তার বিরক্তি আরেকটু বাড়ল শুধু। দু'টি বৃদ্ধ মানুষকে নিয়ে যে এমন অসভ্যতা করতে পারে সে যে কতখানি ইতর, বলে না দিলেও চলে।

গেটের পর অনেকখানি খোলামেলা জায়গা। একধারে ছোটখাটো বাগান, আরেক ধারে কুয়োতলা, ঘাসের জমি। মাঝখান দিয়ে সুরকির রাস্তা।

কথা বলতে বলতে ওরা গাড়ি-বারান্দার নীচে এসে পড়ল। একটা মধ্যবয়সী হিন্দুস্থানী চাকর খুব পুরনো মডেলের একটা ফোর্ড গাড়ি ঝাড়ামোছা করছিল। তপতীকে দেখে বালকের মতন আনন্দে সে প্রায় লাফিয়ে উঠল, 'আরে দিদিমণি, আপ কব আ গয়ী?'

'আজই।' তপতী হাসল।

'আইয়ে আইয়ে—' বলেই সে ভেতর দিকে খবর দিতে ছুটল।

তপতী দাঁড়াল না, সোমাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে দোতলায় উঠে এল। আর উঠতেই দেখা গেল সিঁড়ি মুখে একটি বৃদ্ধ আর বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছেন। দু'জনেই প্রচণ্ড মোটা; দেখেই টের পাওয়া যায় তাঁদের বাতের শরীর। এখন বেশ গরম পড়ে গেছে। তবু দু'জনের পায়ে পুরু মোজা, গলায় কম্ফোর্টার। হয়তো ওঁরা শীতকাতুরে, কিংবা একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়। তাই চারিদিকে দুর্গ সাজিয়ে রেখেছেন। সোমা অনুমান করল, এঁরাই তপতীর ভাবী শ্বশুর-শাশুড়ী। দারুণ মোটা বলেই হয়তো এঁদের নিয়ে কার্টুন এঁকেছে মৃন্ময়।

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার পিছনে গণ্ডাদুয়েক ঠাকুর-চাকর দাঁড়িয়ে ছিল।

তপতীকে দেখে তারা ভারি খুশি, তাদের চোখে হাসি ছলকে ছলকে যাচ্ছে।

তপতী বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে প্রণাম করল; দেখাদেখি সোমাও। স্নেহময় উজ্জ্বল চোখে বৃদ্ধা বললেন, 'এই মেয়েটি কে রে তপতী? আগে তো দেখি নি।'

সোমার পরিচয় দিল তপতী। এবার বৃদ্ধ বললেন, 'সোমা মা, তপতীর সঙ্গে তুমি আমাদের বাড়ি এসেছ, খুব খুশি হয়েছি। চল ভেতরে গিয়ে বসি—'

বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা ওদের নিয়ে সামনের একটা ঘরে এলেন। তপতীদের সোফায় বসিয়ে পুরু গদীওলা দু'টো ইজিচেয়ারে তাঁরা প্রায় শুয়েই পড়লেন। সিঁড়ির মুখ থেকে ঘর পর্যন্ত আসতে দুজনেই ক্লান্ত হয়ে গেছেন; বড় বড় শ্বাস পড়ছে। কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে বৃদ্ধা তপতীর খবর নিলেন। কবে এসেছে, ক'দিনের ছুটি, কেমন আছে, এতদিন আসে নি কেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর বৃদ্ধা বললেন, 'সোমেশ তোকে এর মধ্যে চিঠিপত্র দিয়েছে?'

সোমা অনুমান করল, ছেলেবেলা থেকে দেখছেন বলেই ওঁরা তপতীকে 'তুই' করে বলে।

তপতী রক্তাভ মুখ নীচু করে বসে থাকল।

বৃদ্ধা বললেন, 'তুমি না আজকালকার মেয়ে; অত লজ্জা কিসের?'

মৃদু গলায় তপতী বলল, 'মাসখানেক আগে একটা পেয়েছিলাম।'

'কাল সোমেশের চিঠি এসেছে। তুইও নিশ্চয় পাবি। খুব সুখবর আছে।'

দ্রুত মুখ তুলেই নামিয়ে নিল তপতী; তার চোখ আগ্রহে ঝকমক করছে।

বৃদ্ধা বললেন, 'সোমেশ ডক্টরেট পেয়ে গেছে; মাস তিনেকের মধ্যেই ফিরছে।'

তপতী এবারও কিছু বলল না। পাশ থেকে সোমা লক্ষ্য করল তপতীর চোখমুখ সারা গায়ে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ছে।

সোমেশের মা বললেন, 'সোমেশ এলে আমি কিন্তু আর কোন কথা শুনব না। প্রথম যে তারিখটা পাব সেদিনই দু হাত এক করে দেব। এখন তো তেমন জোর নেই কিন্তু বিয়েটা হয়ে যাক, কলকাতায় পড়ে থাকা চলবে না।'

সোমেশের বাবা বললেন, 'কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে। আমার একটা ছেলের বৌ, সে চোখের আড়ালে দূরে দূরে থাকবে, সেটি হবে না। ছেলেকেও জানিয়ে দিয়েছি, ডক্টরেট হও আর যা-ই হও, চাকরির জন্যে দিল্লী-কলকাতা-বোম্বাই যেতে পারবে না; পূর্ণিয়াতেই যা পাও জুটিয়ে নিতে হবে। বেশি টাকা আমাদের দরকার নেই।'

সোমেশের মা বললেন, 'এই বুড়ো বয়সে ছেলে ছেলের বৌকে ছেড়ে থাকতে পারব না বাপু।' বলতে বলতে হাতের ভর দিয়ে উঠে বাইরে চলে গেলেন। একটু পর যখন ফিরে এলেন সঙ্গে দুটো চাকর। তাদের হাতে নানারকমের প্লেটে রাজ্যের খাবার।

সোমেশের মা নিজের হাতে দুটো ছোট টেবিল টেনে এনে তপতীদের সামনে রাখতে রাখতে চাকরদের বললেন, 'এখানে প্লেটগুলো দে—'

খাবার দেখেই আদুরে কিশোরীর মত নাকে কাঁদতে শুরু করল তপতী, 'এত কখনো খাওয়া যায়?'

সোমেশের মা বললেন, 'নিশ্চয়ই খাওয়া যায়, তোদের বয়েসটাই তো খাবার বয়েস। যা হাতে করে দেবে লক্ষ্মীমেয়ের মত খেয়ে নিবি।' কখনও ধমকে কখনও পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি তপতীকে খাওয়াতে লাগলেন। বলতে লাগলেন, 'কলকাতার হস্টেলে কি যে খাস, তুই-ই জানিস। ছ'মাস আগে দেখেছিলাম তখনও কি সুন্দর চেহারা। আর এখন কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে, গায়ের রং কালি। দাঁড়াও তোমাকে একবার হাতে পাই—'

আরো কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করে তপতীরা উঠে পড়ল। সোমেশের বাবা-মা বার বার বলে দিলেন বিয়ের সময় সোমা যেন নিশ্চয়ই আসে; আগে থেকেই তাঁরা নিমন্ত্রণ করে রাখলেন। তারপর ওঁরা দু'জনেই ভারী শরীর নিয়ে গেট পর্যন্ত তপতীদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে তপতী বলল, 'আমার শ্বশুর বাড়ি কেমন দেখলি বল্—'

সোমা বলল, 'খুব ভাল।'

'আর শ্বশুর শাশুড়ী?'

'চমৎকার। তোকে খুব ভালবাসে।'

'সবই ভাল। তবে—' মুখ কাচুমাচু করে কপট ভয়ের গলায় তপতী বলল,

'এই শাশুড়ীর পাল্লায় পড়লে খেয়ে খেয়েই আমি মরে যাব।'

তপতীকে কত উজ্জ্বল সুখী এবং পরিতৃপ্ত দেখাচ্ছে। হঠাৎ ভীষণ ঈর্ষা হতে লাগল সোমার। এমন একটা সুখের ঘরে সে-ও তো আসতে পারত। কিন্তু সেই লোকটা? স্মৃতির অতল থেকে উগ্র দুর্গন্ধের মত উঠে এল বিকাশ। সেই পুরনো বিষাদটা আবার যেন চারিদিক থেকে জাল ছোট করে এনে তাকে ঘিরে ফেলতে লাগল।

অন্যমনস্কের মত তপতীর সঙ্গে টাঙ্গায় ফিরে এল সোমা। টাঙ্গাওলার পাশ থেকে মৃন্ময় চেঁচিয়ে উঠল, 'গেলি পাঁচ মিনিটের জন্যে, এলি তিনঘণ্টা কাটিয়ে। বুড়োবুড়ির সঙ্গে কী এত গল্প করছিলি?'

সত্যি অনেক দেরী হয়ে গেছে। যখন সোমেশদের বাড়ি যায় তখনও চারিদিকে রোদের ছড়াছড়ি। কিন্তু এখন দিনের আলো বলতে কোথাও কিছু নেই, অন্ধকারে সব ঝাপসা। একটা দুটো করে তারা ফুটছে। রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো চোখ মেলতে শুরু করেছে।

তপতী বলল, 'এই কত রকম—'

মৃন্ময় বলল, 'বুড়োবুড়ির সঙ্গে এতক্ষণ কাটালি। সোমেশ থাকলে দেখছি গল্পে গল্পে রাত কাবার করে ফেলতিস।'

সে যে একটা কলেজের অধ্যাপিকা, তপতীর মনে রইল না। চপলা বালিকার মত সে জিভ ভাংচাল, 'এ—হে—হে, তোমায় বলেছে—'

টাঙ্গা চলতে শুরু করেছিল। মৃন্ময় বলল, 'এখনই বাড়ি ফিরে কি হবে। চল্ কাপ্তান পুল পর্যন্ত ঘুরে আসি। একটু পর পূর্ণিমার চাঁদ উঠবে। যা ভাল লাগবে না—'

তপতী উৎসাহের গলায় বলল, 'তাই চল।'

টাঙ্গা লাইন বাজার ধরে কাপ্তান পুলের দিকে চলল। মৃন্ময় এবার সোমাকে বলল, 'তপীর শ্বশুর-শাশুড়ীকে কি রকম দেখলেন ম্যাডাম? জোড়া বিন্ধ্য পর্বত, না? কার্টুনের এমন সাবজেক্ট আর হয় না—'

সোমা উত্তর দিল না।

আবার যেন কি একটা বলল মৃন্ময়, সোমা এবার আর শুনতে পেল না। কাপ্তান পুলের দিকে যেতে যেতে রুপোর থালার মত চাঁদটা কখন দিগন্তের তলা থেকে উঠে এল, কখন লাইন বাজার পার হয়ে দু'ধারে ধু-ধু মাঠ আর বিল আর ঝোপঝাপ গাছপালা কুয়াশায় আবছা হয়ে যেতে লাগল, কখন দক্ষিণ দিক থেকে ঝিরঝিরে স্নিগ্ধ বাতাস ছাড়ল, সোমা জানে না। সেই লোকটা যার

নাম বিকাশ, বিকাশ মিত্র এখন তার অস্তিত্ব জুড়ে একটা দুর্গন্ধময় কদর্য মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে।

বিকাশকে প্রথম দেখেছিল কবে? স্পষ্ট মনে আছে, বছর পাঁচেক আগে—এক পিকনিকে।

লক্ষ্ণৌ থেকে সে বছরই প্রথম কলকাতায় এসেছে সোমা। সেন্ট্রাল ক্যালকাটার এক হোস্টেলে থাকত আর ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করত। ইউনিভার্সিটি আর হোস্টেল ছাড়া জটিল অরণ্যের মত এই বিশাল শহরের প্রায় সবটুকুই তার অচেনা। অবশ্য ছুটিছাটায় কিংবা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে দু'একটা সিনেমা-টিনেমা দেখত। উত্তরে শ্যামবাজার, দক্ষিণে চৌরঙ্গি—তার কলকাতা এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারের শেষাশেষি ক্লাসের এক বন্ধু, রুবি—রুবি দত্ত, দারুণ আপস্টার্ট, ঠোঁটে নখে টকটকে রঙ, গায়ে আট ইঞ্চি ঝুলের স্লীভলেশ ব্লাউজ, আঁকা চোখে চাকার মত প্রকাণ্ড গগল্‌স্‌, উন্মুক্ত ঘাড় পেট এবং বুকের অনেকটা—একদিন বলল, 'এই সোমা, আসছে রোববার আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবি।'

কলকাতার মেয়ে বলেই হয়তো, কিংবা নিজের স্বভাবের মধ্যেই স্নিগ্ধ অনুদ্ধত একটি চিরকালের বাঙালী মেয়ে আছে বলেই কিনা, রুবিকে খুব একটা পছন্দ করত না সোমা। অথচ এই মেয়েটা সম্বন্ধে তার দুরন্ত আকর্ষণও ছিল। কেন ছিল, সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অনুভূতির। সোমা বলেছিল, 'কোথায়?'

'পিকনিকে।'

'পিকনিকটা কলকাতাতেই হবে?'

'আরে না, কলকাতায় পিকনিক করে মজা আছে নাকি? তার চাইতে ভাল একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে এলেই হয়। ঠিক করেছি ব্যারাকপুর গঙ্গার ধারে একটা বড় বাগানবাড়ি নেব—'

'সে এখান থেকে কতদূর?'

'কাছেই এতদিন কলকাতায় এসেছিস, শহরটা ভাল করে দেখলিই না; কারো সঙ্গে মেলামেশাও করিস না। একেবারে পল্লীবালার মত ঘরের কোণে আটকে আছিস। তোকে মানুষ করতে হবে দেখছি।'

ভয়ে ভয়ে সোমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কখন যেতে হবে?'

'সকালে।'

'ফিরবি কখন?'

'আগে তো যাই; তারপর ফেরার কথা।'

'আর কে কে যাচ্ছে?'

'এই আমাদের ক'জন বন্ধুটন্ধু—' ক্লাসের ক'টি মেয়ের নাম করেছিল রুবি। তারপর বলেছিল, 'তা ছাড়া বাইরেরও আছে।'

তপতী জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাইরের কারা?'

'সে আছে, তুই চিনবি না।'

'পিকনিকটা পুরোপুরি মেয়েদেরই তো?'

রুবি থমকে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ অবাক তাকিয়ে থেকে আচমকা শব্দ করে হেসে উঠেছিল, হাসতে হাসতে তার পেটে খিঁচ ধরে যাচ্ছিল যেন। এমন অদ্ভুত মজার কথা আগে আর কখনও শোনে নি সে।

বিমূঢ়ের মত সোমা বলেছিল, 'হাসছিস যে?'

'হাসব না তো কি। তুই কোন্ যুগের মেয়ে রে?'

সোমা থতিয়ে গিয়েছিল, 'না, মানে—'

'মানে-টানে থাক; এখন লক্ষ্মী মেয়ের মত কুড়িটা টাকা চাঁদা বার কর তো।'

সেই রবিবারই ব্যারাকপুর গিয়েছিল সোমা। সেখানে গিয়ে দ্যাখে অনেক যুবক-যুবতী আগেই এসে গেছে। মেয়েদের চাইতে ছেলেদের ভিড়ই বেশি।

ক্লাসের ক'টি বন্ধু ছাড়া অন্য ছেলেমেয়েরা তার অচেনা। মেয়েগুলোর সাজসজ্জা রুবির মতই। ফাঁপানো চুল, রাঙানো নখ, আধ-খোলা শরীর। ছেলেদের টাইট লো-কাট ট্রাউজার আর জ্যাকেট কিংবা শার্কস্কিনের কলারওলা পাঞ্জাবি। কাঁধ পর্যন্ত নেমে আসা হিপি-মার্কা চুল, মোটা লম্বা জুলপি, কারো কাঁধে ক্যামেরা, কারো ট্রানজিস্টর। দেখতে দেখতে সোমার মনে হতে লাগল, এই যুবক-যুবতীরা নতুন অ্যাফ্লুয়েন্ট সোসাইটি থেকেই বুঝিবা উঠে এসেছে।

রুবি সবার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল, 'হিয়ার ইজ আওয়ার নিউ ফ্রেণ্ড সোমা-'ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর যাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হল তাদের এক গাদা নাম বলে গেছে রুবি, 'এ হল পল্লব, এ সোনিয়া, এ জয়া, এ বিপ্লব, এ সোমনাথ, এ ইন্দ্রাণী, এ হল বরুণ।' সবার শেষে রুবি যার নাম করেছিল সে বিকাশ, বিকাশ মিত্র। এতগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে সে-ই সব চাইতে স্মার্ট, সব চাইতে ফর্সা। তার দিকে তাকিয়ে সোমার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল।

রুবি বলেছিল, 'এ হল বিকাশ, আওয়ার ওল্ড প্যাল। এ বাড়ীর মেকানিক্যাল

ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে। আর হয়েই দারুণ একখানা চাকরি বাগিয়ে ফেলেছে। স্টার্টিংয়েই দেড় হাজার টাকা। দু-এক বছরের ভেতর ওদের কোম্পানী ওকে আমেরিকা-টামেরিকা পাঠিয়ে দেবে।'

রুবি সমানে বকে যাচ্ছিল ; সোমা কিন্তু বিশেষ শুনছিল-টুনছিল না। বিকাশের দিকে পলকহীন তাকিয়ে ছিল সে।

এদিকে পরিচয়-টরিচয় হয়ে যাবার পর সোমা দু'হাত জোড়া করতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিজের হাত বাড়িয়ে সোমার একটা হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলেছিল বিকাশ, 'সো গ্ল্যাড টু মীট ইউ। নাউ উই আর অল ফ্রেণ্ডস ; আমি কিন্তু তোমাকে আপনি-টাপনি করে বলতে পারব না। অ্যাণ্ড আই উইল এক্সপেক্ট, তুমিও আমাদের তুমি করেই বলবে।'

রুবি সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়েছিল, 'ও সিওর, সিওর।' সোমা উত্তর ছায় নি।

রুবি আবার বলেছিল, 'বুঝলে বিকাশ, আমার এই বন্ধুটা দারুণ শাই। ভেবেছিলাম আমিই ওকে মানুষ-টানুষ করব। কিন্তু এ ব্যাপারে তোমার এফিসিয়েন্সি আমার চেয়ে অনেক বেশি। তুমিই ওর দায়িত্ব নাও।'

বিকাশ দুই হাত দু'দিকে ছড়িয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিল, 'মোস্ট গ্ল্যাডলি।'

'তোমরা কথাবার্তা বল ; আমি পল্লবের কাছে যাই।' দূরে ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড জামরুল গাছের তলায় যে যুবকটি ট্রানজিস্টর শুনছিল, প্রায় উড়তে উড়তে তার কাছে গিয়েছিল রুবি।

একটু চুপ করে বিকাশ বলেছিল, 'চল, কোথাও বসি ; তোমার সঙ্গে জমিয়ে খানিকটা আড্ডা দেওয়া যাক।'

সোমার আপত্তি ছিল না ; এমন অসঙ্কোচ স্মার্ট ছেলে আগে আর কখনও ছাখে নি সে। বেশ ভালই লাগছিল, আর পায়ের তলায় স্রোতের টান অনুভব করছিল সোমা।

একটা পছন্দমত জায়গার খোঁজে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিল বিকাশ। চারধারে গাছপালা, মাধবীলতার ঝোপ, ঝোপগুলোর ভেতর সিমেন্টের বেঞ্চ, সেগুলোর মাথায় লাল নীল ছাতা ; সেই দিনটার জন্য ওই ছাতাগুলো লাগানো হয়েছিল। মাঝখানে প্রকাণ্ড লম্বাটে দীঘি, এক দিকে সানবাঁধানো লাল ঘাট, আরেক দিকে ডাইভিং বোর্ড। বোর্ডটার ওপাশে পোশাক বদলাবার জন্য দুটো বড় ঘর। একটা পুরুষদের জন্য, অন্যটা মেয়েদের।

দেখতে দেখতে দীঘির দক্ষিণ প্রান্তে একটা ছায়াচ্ছন্ন নির্জন ঝোপ চোখে পড়েছিল বিকাশের। সে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'গ্র্যাণ্ড, চল, ওখানে গিয়ে বসি।'

ঝোপটার দিকে যেতে যেতে সোমা লক্ষ্য করছিল, মাধবীলতার ঝাড়গুলোর কিংবা বড় বড় গাছের তলায় জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী বসে আছে। অনেকে আবার দলবদ্ধভাবে পুকুরপাড়ের সরু নুড়ি বিছানো রাস্তায় ঘুরছিল, অনেকে আড্ডা দিতে দিতে হুল্লোড় করছিল।

ওরা যখন পাশাপাশি হাঁটছিল, তখন আশপাশ থেকে নানারকম মন্তব্য ভেসে আসছিল, 'চীয়ার ইউ লাকি ডগ—কিংবা উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক—'

হেসে হেসে সবার উদ্দেশ্যেই বিকাশ বলছিল, 'থ্যাঙ্কস্—থ্যাঙ্কস্—থ্যাঙ্কস্—'

কেউ কেউ আবার চোখ টিপে ইঙ্গিত করছিল। মন্তব্যগুলোয় কিংবা চোখের ইশারায় না বুঝবার কিছু ছিল না। সোমার কান গরম হয়ে উঠছিল, চোখমুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। তার ভেতরেই দীঘি-পারের ঝোপে গিয়ে বসেছিল ওরা।

সোমার দিকে পলকহীন তাকিয়ে বিকাশ বলেছিল, 'আমার কিউরিয়সিটি প্রায় ফেমিনিন বলতে পারো। এখন তোমার কথা বল—ডিটেল্‌স্ চাই, কিছু বাদ দেবে না।'

'আমার কোন্ কথা?'

'এই তোমার ফ্যামিলির, তোমার অ্যাম্বিসনের, তোমার ভবিষ্যতের।'

সোমা তাদের ফ্যামিলির কথা বলেছিল। অ্যাম্বিসান সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়েছিল। আর ভবিষ্যৎ? এ ব্যাপারে তখনও তেমন কিছু ভাবে নি সে।

বিকাশও তার সব কথাই বলেছিল। তার বাবা রেয়ার প্রিশিসান মেশিনারির ইমপোর্ট লাইসেন্স পেয়ে কিছু টাকা পয়সা করেছেন, নিউ আলিপুরে তাদের নতুন বাড়ি হয়েছে, বিকাশের ভাই-বোন কেউ নেই; সে একা। জীবনে তার বিরাট উচ্চাশা; কিছুদিন এখানে চাকরি-বাকরি করে কোম্পানির পয়সায় সে আমেরিকায় যাবে; ওখানে রীসার্চ করবার খুব ইচ্ছা; ফিরে এসে একটা কারখানা খুলবে। ইত্যাদি ইত্যাদি—

গল্পে গল্পে দুপুর হয়ে গিয়েছিল। পুকুরের ওধারে একটা ঘর থেকে খাবারের সুঘ্রাণ ভেসে আসছিল। বাবুর্চি-টাবুর্চি নিয়ে আসা হয়েছে, তারাই ওখানে রান্না-বান্না করছিল।

এই সময় একটি যুবক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছিল খাবার রেডি, এবার সবাই স্নান করে নাও। তারপরেই দেখা গেল, ঝোপঝাড় থেকে গাছতলা থেকে যুবক-যুবতীরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে ডাইভিং বোর্ডের ওপাশের ঘরে ছুটল। একটু পর সুইমিং কস্টিউম পরে যখন ওরা বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপ

ছিল সে দৃশ্য তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারছিল না সোমা।

বিকাশ বলল, 'চল, স্নান করি—'

সোমা মাথা নাড়ল, 'আমি স্নান করে এসেছি! তা ছাড়া সাঁতার জানি না। পুকুরে কখনও নামি নি।'

উৎসাহের গলায় বিকাশ বলল, 'তা হলে তো নামাতেই হয়; একস্ট্রা কস্টিউম নিশ্চয়ই দু-একটা পাওয়া যাবে। চল, তোমাকে সাঁতার শেখাই।'

জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে সোমা বলল, 'না না, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি স্নান করে আসুন।'

হঠাৎ চোখ গোল করে বিকাশ বলল, 'এটা কি রকম হল? উই আর ফ্রেণ্ডস, একটু আগে জেন্টলম্যান্‌স এগ্রিমেন্ট হল, আমরা তুমি করে বলব। অথচ তুমি এখনও আপনি করে চালাচ্ছ!'

'একদিনে কি আর তুমি বলতে পারব! তার জন্যে সময় লাগবে।'

'তোমার বন্ধু রুবি কিন্তু প্রথম দিনই বলেছিল।'

'আমি যে রুবি নই।'

একপলক সোমাকে দেখে নিয়ে বিকাশ বলেছিল, 'তা ঠিক; তুমি ডিফারেন্ট।' বলেই সে টয়লেটের দিকে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে জলে ঝাঁপ দিয়েছে। তারপর বদ্ধ জলাশয়ে মাছের মত যুবক-যুবতীরা যেভাবে খেলতে লাগল, এমন খেলার দৃশ্য আগে আর কখনও ছাখে নি সোমা।

স্নানের পর হৈ-চৈ করে খাওয়া-দাওয়া। তারপর সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাছতলায় অনেকক্ষণ গড়িয়ে নিল। রোদের রঙ যখন হলুদ হয়ে এল, সেইসময় রুবি বলল, 'এবার একটু গান-টান হোক—'

'গ্র্যাণ্ড আইডিয়া!' লোকসভায় প্রস্তাব পাস করার মত সবাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সায় দিল।

বিকাশ হঠাৎ বলে উঠল, 'আমার একটা বক্তব্য আছে। আমাদের নিউ ফ্রেণ্ড, মানে সোমা আজ গান-টান গেয়ে কিংবা বাজিয়ে কিংবা নেচে আমাদের আনন্দ বর্ধন করবে।'

'লাভলি প্রোপোজাল। আমরা হোল-হার্টেডলি সমর্থন করছি।'

বিব্রতভাবে চারদিকে তাকিয়ে সোমা বলল, 'দেখুন, আমি নাচ-গান-টান কিছু জানি না। ম্যাক্সিমাম একটা আবৃত্তি করতে পারি।'

একটা ছেলে ঠোঁট ছুঁচলো করে বলল, 'আবৃত্তি! মানে রেসিটেশন। কি রিসাইট করতে চান?'

'রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা।'

'রবীন্দ্রনাথ! দেখুন ওই মানুষটার ওপর আমাদের সবার দারুণ শ্রদ্ধা; কিন্তু আমাদের গেট-টুগেদারে রবীন্দ্রনাথকে টানাটানি না করাই ভাল। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা লাইট; হুল্লোড়বাজি আর কি। তার ভেতর গুরুগম্ভীর জিনিস ঢোকালে আনন্দটাই নষ্ট। আপনি বরং আজ আমাদের পারফর্মেন্স দেখুন। পরে আরেক দিন পার্টিসিপেট করবেন।'

মনে মনে ছেলেটাকে হাজারটা ধন্যবাদ দিল সোমা। মুখে বলল, 'সেই ভাল।'

একটি মেয়ে তার নাম ইন্দ্রাণী, বলল, 'তা হলে বিকাশ, তোমার পপ গান দিয়েই আজ শুভারম্ভ হোক--'

'গ্ল্যাডলি—' বিকাশ উঠে দাঁড়াল। তারপর দু'হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে শুরু করল, 'মাই ডার্লিং—মাই ডার্লিং, কেম ডাউন ফ্রম দা সিলভারি মুন—বাম্বা—বাম্বা—'

আরেকটি ছেলে স্প্যানিস গীটার বাজিয়ে বিকাশকে সাহায্য করতে লাগল।

পর পর আটটা গান গাইল বিকাশ। তার গলা বেশ ভালই, সুরেলা। বিকাশের গানের পর রুবিরা ক'টি মেয়ে এবং ক'টা ছেলে টুইস্ট আর চা-চা-চা নাচল। তারপর শুরু হল ফোটো তোলা। চারধারে শুধু ক্লিক-ক্লিক-ক্লিক। সব চাইতে বেশি ফোটো তুলেছিল বিকাশ; তার সাবজেক্ট একটাই—সে হল সোমা। সোমার ফোটো তুলে তুলেই সে ফিল্ম শেষ করে ফেলেছে। ছবি তোলার পর সবাই ড্রিঙ্ক করল।

সন্ধ্যের পর ওরা কলকাতায় ফিরে এসেছিল। এমন কি মেয়েরাও। রুবি তো ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ড্রিংক করেছে। সোমাকে সবাই অনুরোধ করেছিল; হাতজোড় করে সে কোনরকমে আত্মরক্ষা করেছে। এক গাড়িতে রুবি, বিকাশ, ইন্দ্রাণী, পল্লব আর সোমা। গাড়িটা বিকাশের, সে-ই চালাচ্ছিল। তার পাশে সোমা, তারপর রুবি। সোমা অন্যমনস্কের মত সারা দিনটার কথাই ভাবছিল। ফ্রী মিক্সিং বলে একটা শব্দ আছে; এই কি তার নমুনা?

হঠাৎ পাশ থেকে রুবি বলে উঠেছিল, 'আজকের দিনটা কি রকম লাগল সোমা?'

সোমা বলেছিল, 'ইন্টারেস্টিং; দারুণ একটা অভিজ্ঞতা হল।'

'তুই তো আসতেই চাইছিলি না।'

সোমা উত্তর দ্যায় নি।

বিকাশ ওধার থেকে বলেছিল, 'মাঝে মাঝেই আমরা এই রকম মিলে মিশে

একটু আধটু আনন্দ করি। এবার থেকে সব গেট-টুগেদারে তোমাকে চাই কিন্তু।'

আধফোটা গলায় সোমা বলেছিল, 'পরীক্ষা আসছে; এখন আর সময় কোথায়?'

বিকাশ বলেছিল, 'রোজ রোজ তো আর পিকনিক-ফিকনিক হচ্ছে না। তা ছাড়া পরীক্ষার এখনও এক বছর দেরি। শুধু বই নিয়ে থাকলেই কি হয়, প্যাস্টাইমও দরকার।'

এক সময় ওরা কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছিল। রুবির কথামত সোমাকে তার হোস্টেলের কাছে নামিয়ে দিয়ে বিকাশ বলেছিল, 'তুমি এখানেই থাক নাকি?' জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে হোস্টেল বাড়িটা ভাল করে দেখে নিয়েছিল সে।

সোমা মাথা নেড়েছিল।

বিকাশ আবার বলেছিল, 'হোপ টু মীট ইউ এগেন—ফির মিলেঙ্গে।'

উচ্ছ্বাস এবং অনুচ্ছ্বাসের মাঝামাঝি একটা জায়গা থেকে সোমা শুধু বলেছিল 'আচ্ছা।'

তারপর একটা সপ্তাহও কাটে নি। এক ছুটির দিনের দুপুরে হোস্টেলবাড়ির দোতলায় নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল সোমা, হঠাৎ বিকাশের স্লিপ এল। মেয়েদের হোস্টেল, তাই ওয়েটিং রুম থেকে স্লিপ পাঠাতে হয়েছে। নইলে ও যা ছেলে, দুম করে হয়তো ওপরেই চলে আসত। যাই হোক স্লিপটা হাতে নিয়েও প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিল না সোমা। বিকাশ অবশ্য আবার দেখা করবার কথা বলেছিল। কিন্তু লোকে কত কথাই তো বলে; সব কথা কি রাখবার?

ওয়েটিং রুমে এসে সোমা বলেছিল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ আমিই। খুব অবাক হয়ে গেছ, না?' বিকাশ হেসেছিল, 'সেদিনই কিন্তু বলেছিলাম, আবার দেখা হবে। মনে নেই?'

সোমা ঘাড় কাত করেছিল, অর্থাৎ আছে।

বিকাশ এবার ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়েছিল, 'কী করছিলে?

'তেমন কিছু না। ভাবছিলাম একটু ঘুমোব।'

'দুপুরবেলা ঘুমোয় না; চটপট রেডি হয়ে এস—'

'কী ব্যাপার?'

'আর বল না, এক কাণ্ড করে ফেলেছি।'

'কী?'

'এলিটে দারুণ একটা ছবি এসেছে। তোমার আর আমার জন্যে দু'খানা টিকিট কেটে ফেলেছি।'

একদিনের আলাপে কেউ যে এভাবে সিনেমার টিকিট নিয়ে হাজির হতে পারে, সোমা ভাবতে পারে নি। বিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বলেছিল, 'টিকিটটা কেটেই ফেললেন। আমি যদি এখন হোস্টেলে না থাকতাম?'

একটুও না ভেবে বিকাশ বলেছিল, 'না থাকলে আর কী হত? টিকিট দুটো ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। আর দেরি কর না; শো কিন্তু দুটোয়।'

সোমা একবার ভেবেছিল, যাবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে বিকাশকে না বলবার মত শক্তি তার ছিল না। সে শুধু অনুভব করছিল দুর্দান্ত ঝড়ের মত একটা কিছু তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে শুরু করেছে।

সেই শুরু। তারপর থেকে প্রায়ই হোস্টেলে আসতে লাগল বিকাশ। কখনও সে সোমাকে নিয়ে যেত, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কখনও জি. টি. রোড ধরে অনেকদূর উধাও হত, কোন দিন যেত ফিল্ম সোসাইটির দারুণ দারুণ এক্সপেরিমেন্টাল ছবি দেখাতে যেগুলোর গায়ে শুধু সেক্সের ছড়াছড়ি। তবে সব চাইতে বেশি নিয়ে যেত পার্ক স্ট্রীটের বার-কাম-রেস্তোরাঁগুলোতে। তার ওপর পিকনিক-টিকনিক হুল্লোড়বাজি তো ছিলই।

সোমা টের পাচ্ছিল, বিকাশ তাকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। আপস্মার্ট যুবক যুবতীদের যে ছাঁচ নরম মোমের মত তার ভেতর তাকে ঢেলে অন্যরকম একটা আকার দিতে শুরু করেছিল বিকাশ। সোমার ব্লাউজের ঝুল ছোট হতে হতে আট ইঞ্চিতে ঠেকেছিল; হাতা অদৃশ্য হয়ে স্লিভলেস হয়ে গিয়েছিল; তখন তার ঠোঁট রঞ্জিত, নখ ম্যানিকিওর-করা। চুলে শ্যাম্পু, চোখে চাকার মতো গোল চশমা এবং নাভি পর্যন্ত পেট উন্মুক্ত হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁয় বসে এক-আধদিন বিকাশ এবং অন্য বন্ধুদের সঙ্গে বীয়ার কি শেরী খেয়ে দেখেছে সে। তবে রুবিদের মত পাঁড় মাতাল হয়ে উঠতে পারে নি। সোমা টের পাচ্ছিল কিন্তু কিছু করার ছিল না; পাহাড়ের ঢালে এক টুকরো পাথরের মত সে দ্রুত অতলে নেমে যাচ্ছিল।

এর মধ্যে বছর দেড়েকের মত কেটে গেছে। এম. এ. পাশ করে গিয়েছিল সোমা। তারপরও কলকাতাতেই থেকে গেছে। বিকাশদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ হবার পর লক্ষ্ণৌতে বিশেষ যেত না সে। দশবার যাবার তাড়া দিলে একবার হয়তো যেত। কলকাতা নামে এই শহর জাদুকরের মত তখন তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

এম. এ. পাশ করায় সোমার হাতে প্রচুর সময়। তখন বিকাশের সঙ্গে দারুণ ঘুরছে সে। কোন কোন দিন ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত; এক আধদিন ফিরতই না। এই নিয়ে হোস্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে রোজ কথা-কাটাকাটি,

রোজ ঝগড়া। বাড়ি থেকেও ফিরে যাবার জন্য চিঠি আসছিল। বাবা ছেলে দেখেছেন, সোমার বিয়ে দিয়ে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হতে চান। সোমার তখন কোনদিকেই চোখ ছিল না।

মনে আছে এই সময় বিকাশ অফিস থেকে ক'দিনের ছুটি পেয়েছিল। ছুটিটা কাটাবার জন্য সে গিয়েছিল দার্জিলিং, সঙ্গে সোমা। দার্জিলিং থেকে ফেরার তিন মাস পরেই সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা সোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল; সে প্রেগনান্ট। উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে নিজের দেহের মধ্যে আরেকটি প্রাণের অস্তিত্ব সে টের পেতে লাগল। ভীত বিমূঢ় সোমা বিকাশকে বলেছিল, 'আমার কী হবে?'

সব শুনে শার্ট থেকে টোকা দিয়ে ধুলো ঝাড়ার মত বিকাশ বলেছিল, 'ম্যাটার অফ ফাইভ মিনিট্‌স। তোমাকে কালই একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। সে তোমাকে ফ্রি করে দেবে।'

'কিন্তু—'

'কী'

চোখ-কান বুজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মত সোমা বলেছিল, 'তুমি আমাকে বিয়ে কর।'

'বিয়ে!' এমন একটা অদ্ভুত ভীতিকর শব্দ আগে আর যেন শোনে নি বিকাশ। সে বলেছিল, 'এই সামান্য ব্যাপারের জন্যে বিয়ে? জানো, রুবি দু'বার অ্যাবরসান করিয়েছে, ইন্দ্রাণী একবার! করবী হেমারা কতবার ডাক্তারের কাছে গেছে হিসেব নেই। ইট্‌স্ এ সর্ট অফ এনজয়মেণ্ট। বিয়ে করে এর মধ্যেই ফেঁসে যেতে চাই না। ডাক্তার-ফাক্তার ওষুধ-টোষুধের ব্যবস্থা থাকতে কে ওসব ঝামেলায় যায়। কালই তোমাকে আবার পবিত্র কুমারী করে দিচ্ছি।'

সোমা বুঝেছিল, বিকাশ বিয়ে করবে না। অথচ তার কথা না শুনে উপায়ও ছিল না। পরের দিন ডাক্তারের প্রাইভেট নার্সিং হোমে ঘণ্টা ছয়েক কাটিয়ে সোমা যখন ফিরে এসেছিল তখন আর দুশ্চিন্তা নেই; বিকাশের ভাষায় আগের মতই সে কুমারী। কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টায় তার মধ্যে নিদারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মত কিছু একটা ঘটে গেছে। নিজেকে সে ততক্ষণে আবিষ্কার করে ফেলেছে। যতই ঠোঁট নখ ম্যানিকিওর করুক, যতই হেয়ার-টনিকে চুল ফাঁপাক, বীয়ারের গেলাসে চুমুক দিক, নাভির তলায় শাড়ি পরুক, তার ভেতর চিরদিনের সংস্কার-ভীরু একটি মেয়ে আছে। সেদিন থেকে সে আর হোস্টেল থেকে বেরুত না। জীবন মানে এক নিষ্ঠুর খেলোয়াড় খোলাম-কুচির মত তাকে অসীম শূন্যতায়

ছুঁড়ে দিয়েছিল। সমস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনেছিল সোমা; তাকে ঘিরে অন্তহীন বিষাদ জমতে শুরু করেছিল।

তারপরও বিকাশ অনেকবার এসেছে, কবিরা এসেছে। সোমা দেখা করে নি। ওয়েটিং রুম থেকেই ওরা ফিরে গেছে। লক্ষ্ণৌতে এক-আধবার গেছে কিন্তু দু-চার দিনের বেশি থাকতে পারে নি। তার মনে হয়েছে, বেশিদিন থাকলে বাবা-মা'র চোখে সে ধরা পড়ে যাবে। নিদারুণ পাপবোধ তখন তাকে নিয়ত দগ্ধ করেছে।

যাই হোক এই সময় একটা কলেজে লেকচারারশিপ পেয়ে গিয়েছিল সোমা। পড়াতে গিয়ে ওখানেই তপতীর সঙ্গে আলাপ। আলাপের দিন থেকেই এই উজ্জ্বল প্রাণবন্ত মেয়েটা তার বন্ধু। যত দিন গেছে তপতীর প্রীতি, তপতীর ভালবাসা তাকে মুগ্ধ করেছে। পৃথিবীতে আলো-হাওয়া-জলের মত তপতীর বন্ধুত্বের তুলনা নেই।

বিষণ্ণ বিবর্ণ মূর্তির মত সারাদিন চুপচাপ থাকতে দেখে তপতী কতদিন ধরে বলে আসছে, পূর্ণিয়ায় নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত এত কাল পর পূর্ণিয়া আসার সময় হল তার।

কতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, সোমা জানে না। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হাসিতে চমকে উঠল সে। দারুণ হাসছে তপতী; টাঙ্গাওলার পাশে বসে মৃন্ময়ও হাসছে।

মৃদু গলায় সোমা বলল, 'কি হল, হাসছিস যে?'

তপতী বলল, 'তোর কাণ্ড দেখে। কি ভাবছিলি অত?'

সোমা থতিয়ে গেল, 'কই, কিছু না তো।'

সামনের সীট থেকে মৃন্ময় বলে উঠল, 'কিছু না বললেই হবে। আমরা দু'জনে কম করে আটাত্তর বার ডেকেছি, আপনার সাড়া নেই। যার ধ্যান করছিলেন, সত্যিই সে ভাগ্যবান।'

সোমার একবার ইচ্ছে হল, উঠে গিয়ে লোকটার গালে চড় কষায়। কিন্তু কিছুই করল না।

আরো ঘণ্টাখানেক রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে তারা গোলাপবাড়িতে ফিরে এল।

বাড়ি ফিরে দেখা গেল তপতীর বাবা এসে গেছেন। তপতীর মা'র মত তপতীর বাবার দিকে তাকিয়েও চোখ ফেরানো যায় না। তাঁকে দেখলে মনে হয়, গ্রীক পুরাণের পৃষ্ঠা থেকে দেবদূত নেমে এসেছে।

তপতীর বাবার সঙ্গে আলাপ হল। মানুষটি ভারি সরল, অমায়িক। চোখ দুটি স্নেহে ভাসো-ভাসো। বললেন, 'তুমি কিছু মনে কর নি তো মা?'

বুঝতে না পেরে সোমা বলল, 'কী ব্যাপারে?'

'তোমরা যখন এলে তখন আমি বাড়ি ছিলাম না। তোমার জন্যে অন্তত থাকা উচিত ছিল।'

'না না, কিছু মনে করি নি। মাসিমাই তো ছিলেন। দোলন-ঝুলন-পিণ্টু ছিল। আপনি না থাকাতে একটুও অসুবিধা হয় নি।'

দুম করে মৃন্ময় বলে উঠল, 'যাঃ বাবা, আমি যে একদিন আগে গিয়ে মনিহারি ঘাট থেকে নিয়ে এলাম, আমার কথাটাই বাদ চলে গেল। একেই বলে বরাত।'

সোমা উত্তর দিল না।

কথায় কথায় অনেক রকম প্রসঙ্গ এল। সোমাদের বাড়ির কথা, দেশের কথা, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা, কলকাতার কথা। দেখা গেল, তপতীর বাবা কোন ব্যাপারেই বিশেষ খবর-টবর রাখেন না, রাখার উৎসাহও নেই। নাইনটিন ফরটি ওয়ানে তিনি শেষবার কলকাতায় গিয়েছিলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ভাসা-ভাসা। আলাপ-টালাপ করে মনে হতে লাগল, ভদ্রলোক এ যুগের নন।

ওদের গল্পের মধ্যেই তপতীর মা এসে তাড়া দিতে লাগলেন, 'রাত হয়েছে, এবার খেতে চল সব।'

খাবার টেবলে বসে আবার গল্প শুরু হল।

হঠাৎ কি মনে পড়তে তপতী তাড়াতাড়ি তার মাকে বলল, 'মা তুমি নাকি মৃন্ময়দাকে চিঠি দিয়ে আনিয়েছ?'

তপতীর মা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওর একটা বিয়ে দেব। আমি মেয়ে দেখেছি।'

টেব্‌লের দূর প্রান্ত থেকে সোমা নিজের অজান্তেই মৃন্ময়ের দিকে তাকাল। কি আশ্চর্য, মৃন্ময়ও তার দিকেই তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল সোমা। আর মৃন্ময় হেসে হেসে তপতীর মাকে বলল, 'ইঁদুরকলে পা দিতে আমি রাজী না।'

তপতীর মা বললেন, 'বিয়েটাকে ইঁদুরকল বলছিস কেন মৃন্ময়?'

মৃন্ময় বলল, 'আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে ঐ কথাটা ছাড়া আর কিছুই মনে আসে না।'

'বার বার একরকম হবে তার কি কিছু মানে আছে?'

'ঘরপোড়া গরু তো; বুঝতেই পারছ।'

'আগের বার নিজেই পছন্দ করে বিয়ে করেছিলি; এবারটা আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ছাখ, ভাল হয় কিনা।'

মৃন্ময় চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ নীরবতার পর তপতীর বাবা একসময় ডাকলেন, 'মৃন্ময়—'

মৃন্ময় তাকাল। তপতীর বাবা বললেন, 'সোমা এসেছে, তোরা ওকে পূর্ণিয়ার চারদিকটা ভাল করে দেখিয়ে দে।'

মৃন্ময় উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই। শুধু পূর্ণিয়া কেন, একদিন যোগবাণীতে নিয়ে নেপাল বর্ডার দেখিয়ে আনব, একদিন যাব মহানন্দা ব্রীজে'—একের পর এক তালিকা দিয়ে যেতে লাগল মৃন্ময়।

দিন দুয়েকের মধ্যে তপতীদের বাড়ির জীবনযাত্রা মোটামুটি জেনে ফেলল সোমা। তপতীর বাবা সকাল হলেই স্নান-টান সেরে চা খেয়ে টিফিন কেরিয়ারে খাবার-টাবার বোঝাই করে পুরনো আমলের সাইকেলে বেরিয়ে পড়েন। মানুষটি অদ্ভুত, সারাদিন নাকি নির্জন মাঠের মাঝখানে বসে থাকেন। পাখি ছাখেন, ফুল ছাখেন, আকাশ ছাখেন, গাছপালা পাখি-টাখি ছাখেন। মানুষের সঙ্গ বিশেষ পছন্দ করেন না। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে, কোন দিন হয়তো খবর এল, দশ মাইল দূরের বনে সাদা শজারু বেরিয়েছে, শুনেই শজারু দেখতে ছুটলেন। কেউ হয়তো বলল অমুক জায়গায় বিচিত্র পাখি দেখা দিয়েছে, কানে আসা মাত্র রওনা হলেন। বিভূতিভূষণের লেখায় প্রকৃতির মনোহর ছবি দেখেছে সোমা; কিন্তু এমন প্রকৃতি-

প্রেমিক আগে আর ছাখে নি সে।

সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তপতীর মায়ের ওপর। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা থেকে কার অসুখ-বিসুখ করল, চাকর-বাকররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কিনা—সব দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

তপতীর ভাইবোনেরা ভারি শান্ত, ভদ্র, বিনয়ী। বাড়িতে তারা আছে কিনা, টের পাওয়া যায় না। তবে তপতীটা দারুণ চঞ্চল। দুমদাম হাঁটছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে, জোরে জোরে শব্দ করে হেসে উঠছে' আর একজনের অস্তিত্বও দারুণভাবে টের পাওয়া যায়—সে মৃন্ময়। নিস্তব্ধ বাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ সে গেয়ে ওঠে, 'তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে সুপ্ত রাতে। আমার ভাঙল যা তাই ধন্য হল চরণপাতে।' কিংবা 'মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে সেদিন ভরা সাঁঝে—' কিংবা 'কইও কথা বন্ধুর কাছে, জল ছাড়া মীন কয়দিন বাঁচে—' কিংবা 'এ দেখো তো য়ঁহা কোই নহী হ্যায়, কোই ভী নহী, পাশ আ য়াঁও না—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

মৃন্ময় সম্বন্ধে আরো কিছু কিছু জেনেছে সোমা। নিজে যেচে জানতে যায় নি, তপতীদের কথাবার্তা থেকে টুকরো টুকরো কানে এসেছে। মৃন্ময়ের মা-বাবা নেই; ছেলেবেলা থেকেই ফুলমাসি অর্থাৎ তপতীর মা'র কাছে সে মানুষ। তার স্বভাবটা অদ্ভুত; কোন কিছুর প্রতিই বিশেষ আকর্ষণ নেই। বড় বড় পাবলিসিটি ফার্মে ভাল ভাল চাকরি নিয়ে কতবার কলকাতা-বোম্বাই গেছে। কিন্তু দু-চার মাস, ভাল না লাগলেই দুম করে ছেড়ে-ছুড়ে চলে এসেছে। আপাতত আছে নয়া দিল্লীতে, কবে ছেড়ে দেবে ঠিক নেই। মৃন্ময়ের জীবনে একটা দুঃখ আছে, তা বিবাহ-ঘটিত। দুঃখটা ঠিক কী ধরনের এখনও জানা হয় নি।

যাই হোক মৃন্ময় আর তপতীর সঙ্গে একদিন নেপাল বর্ডার দেখে এল সোমা, একদিন মহানন্দা ব্রীজ পেরিয়ে গেল ওয়েস্ট দিনাজপুর। আরেক দিন গেল ফরবেসগঞ্জ। মাঝে মাঝে ন্যাশন্যাল হাইওয়ে ধরে সাইকেল রিক্শায় দূর দেহাতেও চলে যেতে লাগল।

এর মধ্যেই একদিন খবর এল সোমেশ আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছে। দেশে আসার কথা ছিল আরো পরে। কিন্তু হঠাৎ সুযোগ পেয়ে যাওয়ার আগেই এসে গেছে।

সোমেশের সঙ্গে সোমার আলাপ করিয়ে দিল তপতী। ভদ্র, নম্র, বুদ্ধিদীপ্ত সোমেশকে দেখে যত না খুশি হল সোমা তার চাইতে অনেক বেশী হল বিষণ্ণ।

এমন বিষাদ আগে আর কখনও অনুভব করে নি সে। তার মনে হতে লাগল, চারপাশের সবাই যেন তাকে বঞ্চিত করেছে।

সোমেশ আসার দু'দিন পর ছিল হোলি। সোমার রঙ খেলার ইচ্ছা ছিল না। তপতী সোমেশ আর মৃন্ময় জোর করে তাকে ঘরের বার করল। অনিচ্ছুক সোমা কারো গায়ে রঙ-টং দিল না, তপতীরা অবশ্য আবীর-টাবীর দিয়ে ওকে ভূত সাজিয়ে ছাড়ল।

রংটা শুধু গায়েই লাগল। মনের ভেতরটা একেবারে বর্ণহীন বলা যায়, শীতের আকাশের মত ধূসর।

হোলির পর থেকে নিজেকে আবার গুটিয়ে আনতে লাগল সোমা। সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গা, তার গাছপালা, মানুষ এবং সুন্দর দৃশ্যপট তাকে খুব বেশিদিন অন্যমনস্ক রাখতে পারল না। সেই পুরনো বিষাদ আবার সোমার চারপাশে ঘন হতে লাগল। ঘর থেকে বেরুতে আর ইচ্ছা হয় না।

সোমেশ ফিরে আসার পর বাড়িতে আর কতটুকু সময় থাকে তপতী। সারাদিনই সে সোমেশের সঙ্গে ঘুরছে। অবশ্য সোমাকেও তাদের সঙ্গে যেতে বলে, সোমেশও দু-একবার এসে অনুরোধ করেছে, সোমা যায় নি। তার কিছুই ভাল লাগে না।

তাদের জন্য নির্দিষ্ট সেই ঘরটায় সারাদিনই চুপচাপ বসে থাকে সোমা, মাঝে মধ্যে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। সামনের বড় জানলাটার বাইরেই গোলাপ-বাগান, বাগানের পর রাস্তার ওধারে গাছপালা, অনেক উঁচুতে আকাশ।

সে-সব দিকেও চোখ যায় সোমার, কিন্তু কিছু যেন দেখতে পায় না সে।

দোলন-ঝুলন কদাচিৎ এ ঘরে আসে। এসেও 'কী করছেন? চা খাবেন কি?' জাতীয় দু-একটা কথা বলেই চলে যায়। তপতীর মা অবশ্য অনেকবার এসে তার খোঁজ নিয়ে যান।

তবে সব চাইতে যে বেশি আসে সে মৃন্ময়। দরজার বাইরে থেকেই চিৎকার করে বলে, 'মে আই কাম ইন' বলেই ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। অনুমতির জন্য অপেক্ষা পর্যন্ত করে না।

সোমা বিরক্ত চোখে তাকায়; কিছু বলে না।

চেয়ারে জাঁকিয়ে বসতে বসতে মৃন্ময় বলে, 'আপনি একটা ফ্যান্টাফ্যাটাস ; সারাদিন ঘরের ভেতর কি করে যে বসে থাকেন !'

নীরস গলায় সোমা বলে, 'আমার শরীরটা ভাল না।'

'কী হয়েছে ?'

সোমা উত্তর দ্যায় না।

মৃন্ময় উদ্বেগের গলায় বলে, 'ডাক্তারকে খবর দেব ?'

সোমা বলে, 'না। আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না।'

একটু চুপ। তারপর সোমার দিকে খানিকটা ঝুঁকে মৃন্ময় নীচু গলায় বলে, 'আমার কী মনে হয় জানেন ?'

'কী ?' কপাল কুঁচকে যেতে থাকে সোমার।

'শরীর আপনার ভালই আছে, গোলমালটা অন্য জায়গায়।'

'তার মানে ?'

'নিজেই ভেবে দেখুন—'

লোকটা কি অন্তর্যামী ? সোমা চমকে ওঠে। তারপরেই তীক্ষ্ণ স্বরে বলে, 'অনুগ্রহ করে আপনি এখন যান। আমাকে একটু একলা থাকতে দিন।'

কখনও এসে মৃন্ময় বলে, 'আপনাকে আজ একটা জিনিস দেখাব।'

সোমা বিরক্ত অথবা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

মৃন্ময় বলতে থাকে, 'নওটঙ্কী কাকে বলে জানেন ?'

'না।'

'প্রচুর নাচ গান দিয়ে একটা পালার মত। বাঙলাদেশে যেমন যাত্রা, অনেকটা সেই রকম।'

নিস্পৃহ স্বরে সোমা বলে, 'ও—'

'আজ ভাট্টাবাজারের কাছে নওটঙ্কীর গান আছে। শুনতে যাবেন ?' উৎসাহের গলায় মৃন্ময় বলতে থাকে, 'খুব ভাল লাগবে ; দারুণ এনজয় করবেন। জিনিসটা যাকে বলে একেবারে সয়েল থেকে উঠে এসেছে, এখানকার মাটির গন্ধ মাখানো।'

'না।'

'কী না ?'

'এসব আমার ভাল লাগে না।'

'জিনিসটা আগে দেখুন, শুনুন। তারপর তো ভাল-লাগা খারাপ-লাগার প্রশ্ন।'

'আমাকে ক্ষমা করুন ; এ ব্যাপারে আমার কোন ইন্টারেস্ট নেই।'

একদিন মৃন্ময় এক কাণ্ড করে বসল। সোমার ঘরে এসে বলল, 'আজ আপনাকে আমি একটা উপহার দিতে চাই।'

'উপহার!' বিমূঢ়ের মত উচ্চারণ করল সোমা।

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার উপহার আমি হাত পেতে নেব কেন?'

'খুব সামান্য জিনিস।'

'সামান্যই হোক আর অসামান্যই হোক, আমি নিতে পারব না।' মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিল সোমার। লোকটার স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

মৃন্ময় বলল, 'দেখুন, জিনিসটা আমি পয়সা দিয়ে কিনি নি। কেনা হলে দিতাম না। আমি একজন আর্টিস্ট, জানেন তো?'

'শুনেছি।'

'আমি একটা ছবি এঁকেছি, সেটাই দিতে চাই।'

সোমা উত্তর দিল না।

মৃন্ময় পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে সোমার সামনের টেবলটায় রাখল। যে ছবিটা আঁকা হয়েছে সেটা একপলক দেখেই সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে চড়ল সোমার। ছবিটা তারই, তলায় লেখা আছে, 'বিষাদের প্রতিমা—দুঃখিনী।' কখন কোন্ ফাঁকে চোরের মত তার ছবি এঁকে নিয়েছে মৃন্ময়, কে জানে।

ঘাড়ের কাছে একটা শির কট করে ছিঁড়ে গেল যেন। হিতাহিতজ্ঞানশূন্যের মত চিৎকার করে উঠল সোমা, 'অসভ্য, জানোয়ার! বেরিয়ে যান এখান থেকে, বেরিয়ে যান—'

দপ করে আলো নিভে যাবার মত মুখটা কালো হয়ে গেল মৃন্ময়ের। নিজেকে টেনে তুলতে তুলতে সোমাকে একবার দেখল সে, তারপর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে চলে গেল।

তারপর থেকে সোমার ঘরে আর আসে নি মৃন্ময়। কিন্তু যখনই সোমা চোখ তুলে জানলার বাইরে তাকিয়েছে তখনই দেখেছে, একজোড়া চোখ তারই দিকে তাকিয়ে আছে। সে চোখ কোমল, সহানুভূতিময়, আর্দ্র। অভদ্র ইতর মৃন্ময় যে এভাবে তাকাতে পারে, কে ভাবতে পেরেছিল। সোমা খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।

আরো ক'দিন পর হঠাৎ সোমা বলল, 'আমি আজ কলকাতা চলে যাব।'

বাড়ির সবাই চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'কিছুতেই না কিছুতেই না। আজ যাওয়া হতেই পারে না।'

দোলন-ঝুলন-পিন্টু অনেক করে থাকতে বলল; তপতীর বাবা বোঝালেন, তপতীও চিৎকার-টিৎকার করল; তপতীর মা বললেন, 'তিন বছর পর যা-ও এলে, দু'দিন থাকতে না থাকতেই চলে যাবে? আর ক'টা দিন থেকে যাও মা।'

কিন্তু কারো কথা শুনল না সোমা।

তপতী বলল, 'কলকাতায় তো তোর কোন কাজ নেই।'

অবুঝের মত সোমা বলল, 'না থাক; তবু যাব। এখানে আমার আর ভাল লাগছে না।'

শেস পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক হল। কিন্তু তাকে কাটিহারে নিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবে কে? তপতীর বাবা যাবেন না, পিন্টুর দু'দিন ধরে জ্বর, আর তপতী আগে থেকেই সোমেশের সঙ্গে এক জায়গায় যাবার প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছে।

সোমা বলল, 'কারোকেই যেতে হবে না; শেয়ারের ট্যাক্সিতে তুলে দিলে আমি একাই চলে যেতে পারব।'

তপতীর মা বললেন, 'তাই কখনো হয়? ভাল কথা, মৃন্ময়ই তো আছে। সে-ই কাটিহারে তুলে দিয়ে আসবে।'

সোমা একবার ভাবল, আপত্তি করে। কিন্তু কিছু বলল না।

কাটিহার থেকে দুপুর দুটোয় মনিহারি ঘাটের ট্রেন। শেয়ারের ট্যাক্সি না, কোত্থেকে একটা প্রাইভেট গাড়ি যোগাড় করে আনল মৃন্ময়। এখান থেকে কাটিহার আর কতক্ষণের রাস্তা; মোটরে গেলে বড় জোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বারোটা বাজবার আগেই খানিকটা সময় হাতে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

ড্রাইভার নেই ; গাড়িটা মৃন্ময় নিজেই চালাচ্ছিল। পিছনের সীটে চুপচাপ বসে আছে সোমা। কেউ কথা বলছিল না।

সেদিনের সেই ব্যবহারের জন্য মনে মনে লজ্জিত ছিল সোমা ; রাগের মাথায় ওভাবে বলা তার উচিত হয় নি। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে দ্বিধার গলায় সে ডাকল, 'মৃন্ময়বাবু—'

সামনের দিকে চোখ রেখেই মৃন্ময় সাড়া দিল, 'বলুন—'

'সেদিনের ব্যাপারটার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

'ক্ষমা আবার কি।'

'দেখুন, ঐসব কথা বলা আমাব অন্যায় হয়েছে। জীবনে হয়তো আর কখনো আপনার সঙ্গে দেখা হবে না ; আপনি যদি ঐ ব্যাপারটা মনে করে রাখেন আমি খুব কষ্ট পাব।'

'মনে করে রাখব না। তা ছাড়া—'

'কী ?'

'কেউ কিছু বললে আমার বেঁধে না, আমার গায়ের চামড়া গণ্ডারের মত পুরু।'

সোমা আর কিছু বলল না। মৃন্ময়ও চুপ করে থাকল।

আজ মৃন্ময় বড় বেশি সংযত। সোমা কথা না বললে আগে থেকে সে কিছু বলছে না, কোনরকম মন্তব্যও করছে না। এমন কি পেছন ফিরে একবার সোমাকে দেখছেও না।

এক পলক মৃন্ময়কে দেখে নিয়ে জানলার বাইরে তাকাল সোমা।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই। দু'ধারে আদিগন্ত মাঠ, পানিফলে বোঝাই মাইলের পর মাইল বিল, টুকরো টুকরো রবিশস্যের ক্ষেত, সিসম গাছের জটলা, ঝোপ-ঝাড়।

কতক্ষণ গাড়িটা চলেছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ হাতঘড়িতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সোমা ; চারটে বাজে। সে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কি, চার ঘণ্টা গাড়ি চলছে, এখনও কাটিহার গিয়ে পৌঁছুলাম না ?'

মৃন্ময় খুব সহজ গলায় বলল, 'আমরা কাটিহারের দিকে গেলে তো পৌঁছুবেন—'

'তার মানে ?'

'তার মানে আমরা অন্য রাস্তায় চলে এসেছি।'

উদ্বিগ্ন মুখে সোমা বলল, 'তা হলে কলকাতায় যাব কি করে ?'

মৃন্ময় বলল, 'কলকাতায় আজ আর যাওয়া হচ্ছে কই? দুটোর ট্রেন দু'ঘণ্টা আগে কাটিহার ছেড়ে চলে গেছে। আজ আর মনিহারি ঘাটের ট্রেন নেই। যেতে হলে কাল। নিশ্চয় আপনাকে কাটিহারে ট্রেন ধরিয়ে দিয়ে আসব।'

'আপনি ভেবেছেন কী?'

'কী ব্যাপারে?'

'আমার কলকাতা যাওয়া কি আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে?'

'আপাতত।'

লোকটার মতলব কী, কে জানে। ভীতভাবে জানলার বাইরে তাকাতে লাগল সোমা। এখন গাড়িটা যেখানে, সেটা একটা মেঠো পথ। দু'ধারে ঝুপসি আম বাগান। মৃন্ময় কী বুঝেছিল, সে-ই জানে। বলল, 'এই জায়গাটাকে আমাদের বিহারের পলাশী বলতে পারেন। আরেকটা খবর আপনাকে দিচ্ছি, এখান থেকে তিন-চার মাইলের মধ্যে কোন দেহাত নেই, লোকজনও নেই। চেঁচিয়ে মরে গেলেও কেউ আসবে না।'

ভয়ার্ত রুদ্ধ গলায় সোমা বলল, 'আপনি কী চান?'

'গাড়ি থেকে নামুন, বলছি।'

নিজের ইচ্ছায় নয়, অদৃশ্য কোন শক্তি সোমাকে যেন ধাক্কা মেরে মেরে গাড়ির বাইরে নামিয়ে নিয়ে গেল। তাকে একটা আমগাছের মোটা শিকড়ে বসিয়ে খানিকটা দূরে মুখোমুখি বসল মৃন্ময়; তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরিয়ে নিল।

কাঁপা গলায় সোমা বলল, 'কী বলবেন বলুন—'

'অত তাড়াতাড়ির কি আছে, আজ তো আর ট্রেন ধরতে হবে না।'

'না হোক; আমি তপতীদের বাড়ি ফিরে যেতে চাই।'

'নিশ্চয়ই। আমিও তো সেখানেই ফিরব। আর তপীদের বাড়ি যেতে হলে আমার সঙ্গেই আপনাকে যেতে হবে।'

সোমা চুপ করে রইল।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে অনেকগুলো ধোঁয়ার আংটি ছাড়ল মৃন্ময়। তারপর বলল, 'আপনার কথা আমার জানতে ইচ্ছে করে।'

'জেনে লাভ?'

'লাভ হয়তো নেই।'

'তবে?'

'কৌতূহল।'

'আমি যদি আপনার কৌতূহল না মেটাই ?'

'মেটাতেই হবে।'

'আপনার হুকুমে ?'

'না। আপনার নিজের জন্য।'

'তার মানে ?'

হাতের ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মৃন্ময়। অন্যমনস্কের মত ক'পা হাঁটল। তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে খুব গাঢ় গলায় বলল, 'আপনি খুব দুঃখী, না ?'

আচমকা বুকের ভেতর অনেকগুলো এলোমেলো ঢেউ খেলে গেল সোমার। স্তিমিত স্বরে সে বলল, 'কে বলেছে আপনাকে ?'

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে মৃন্ময় বলল, 'এখানে একটা দুঃখী মানুষ আছে, সে-ই বলে দিয়েছে।'

মৃন্ময়ের জীবনে যে বেদনা আছে, সোমা তার কিছু আভাস পেয়েছে। সে বলল, 'আপনার ধারণাটা ভুলও তো হতে পারে।'

বুকের ওপর আঙুলটা ছিলই। মৃন্ময় বলল 'এখানে থেকে যে বলে সে ভুল বলে না। তা ছাড়া—'

'কী ?'

'আপনি নিজেও বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনি কত দুঃখী।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ। আপনার চলা-ফেরা, আপনার চুপচাপ বসে থাকা, আপনার চাউনি—এ সবের মধ্যে কী আছে, যে বুঝবার সে ঠিকই বুঝতে পারবে।'

সোমা চুপ।

মৃন্ময় আবার বলল, 'আমার আরো কী মনে হয় জানেন ?'

সোমা তাকাল।

মৃন্ময় বলতে লাগল, 'আপনার দুঃখের কথা কোনদিন কারোকে আপনি বলেন নি, বা বলতে পারেন নি। চেপে রেখে শুধু কষ্ট পাচ্ছেন; আর নিজেকে ধ্বংস করছেন।

লোকটা কি অন্তর্যামী ? যাকে সে ভেবেছিল অত্যন্ত হাল্কা ধরনের বাজে লোক তার মধ্যে যে এমন গভীর হৃদয়বান মানুষ আছে, কে ভাবতে পেরেছিল। সোমা চকিত হয়ে উঠল।

মৃন্ময় বলেই যাচ্ছে, 'আপনি আমাকে বন্ধু বলে মনে করতে পারেন। বলুন;

একজনের কাছে বলেও মনের ভার অন্তত খানিকটা কমান।'

হঠাৎ সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর কি যে হয়ে গেল, কি নিদারুণ প্রতিক্রিয়া, সোমা বলতে পারবে না। এ ভাবে কেউ কোনদিন তার কথা শুনতে চায় নি।

বিচিত্র এক সম্মোহের ঘোরে বিকাশের সঙ্গে জড়ানো তার জীবনের সেই দুর্ঘটনাটার কথা বলে গেল সোমা। বলেই দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

কতক্ষণ কেঁদেছে জানে না, এক সময় সোমা অনুভব করল, তার পিঠে একটি সহানুভূতিময় হাতের কোমল স্পর্শ এসে পড়েছে। চমকে মুখ তুলতেই দেখতে পেল দু'চোখে অপার স্নেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে মৃন্ময়। চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'পুওর গার্ল।'

সোমা উত্তর দিল না।

মৃন্ময় আবার বলল, 'কিন্তু এতে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। জানো, আমার জীবনেও কিছু দুঃখ আছে। একটি মেয়েকে একদিন ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম, সে আমাকে ঠকিয়ে আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে আমারই এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন চলে গেল। তারপরেও ছাখ আমি কেমন হাসি, গান গাই, হৈ-হল্লা করি। ঐ ঘটনাটা একেবারে ভুলেই গেছি।'

হঠাৎ যেন চোখের ওপর ধারালো আলো এসে পড়ল। মৃন্ময়ের এই গান-টান, হল্লা-হুল্লোড়—সব যেন কান্নারই ছদ্মবেশ। রবীন্দ্রনাথের কি একটা কবিতা যেন আছে, এই মুহূর্তে মনে করতে পারল না সোমা।

অনেকক্ষণ পর সোমা বলল, 'আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল।'

মৃন্ময় বলল, 'ধুস, এর জন্যে কোন কিছুই শেষ হয় না।'

মৃন্ময়ের চোখে পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে সোমা বলল, 'সত্যিই হয় না?'

'না, তোমার মাথায় ওটা ফিক্সেশানের মত আটকে আছে। কিন্তু জীবনে শেষ বলে কোন কথা নেই। রোজ সেখানে নতুন করে শুরু করা যায়। সন্ধ্যে হয়ে এল। চল, এবার ফেরা যাক।'

দু'জনে উঠে পড়ল।